উপনিষদের গল্পগুচ্ছ

স্বামী যুক্তানন্দ

উপনিষদের গল্পগুচ্ছ

শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

স্বামী যুক্তানন্দ

UPANISHADER GALPAGUCHHA
SWAMI YUKTANANDA

প্রকাশক ঃ

স্বামী সারস্বতানন্দ
প্রণব কার্যালয়
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১, রাসবিহারী এভিন্যু
বালিগঞ্জ, কোলকাতা - ১৯

দ্বিতায় সংস্করণ ঃ শ্রীশ্রীশিবরাত্রি, ১৪১৫

মূল্য ঃ ২০ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
ঃ সুমিত সরকায়
ক্লাসিক প্রেস
২১ পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

উৎসর্গ

সমগ্র উপনিষদ যাঁর দিব্য জীবন, সমগ্র উপনিষদের সারকথা যাঁর দিব্যবাণী, উপনিষদের অনুবর্তী যাঁর জীবনের সমস্ত কর্ম—সেই উপনিষদ্-প্রতিম বিরাট পুরুষ শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দের শ্রীচরণে এই ক্ষুদ্র অর্ঘ্য নিবেদিত হ'ল।

তাঁরই
শ্রীচরণাশ্রিত
দীন সন্তান

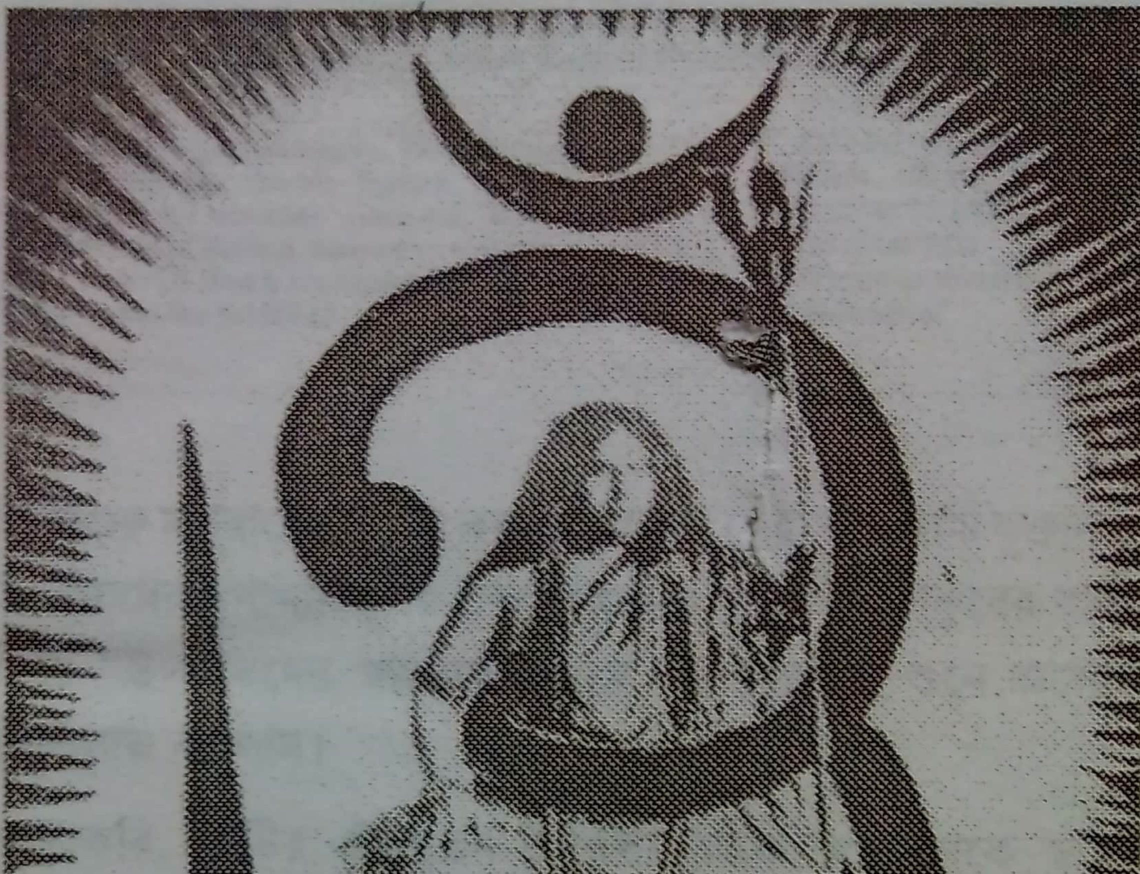

আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা — ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

BHARAT SEVASHRAM SANGHA

(A Registered Socio-Cultural & Philanthropic Organisation)

Founder : Acharya Sreemat Swami Pranavanandaji Maharaj

Branches :

Varanasi, Gaya, Puri, Allahabad, Vrindaban, New Delhi, Hardwar, Kedarnath, Gourikunda, Ukhimath, Badrinath, Kurukshetra, Hyderabad. Surat, Ahmedabad, Jamshedpur, Navadwip, Gangasagar, Dwarka, Guwahati, Rameswaram, Kannyakumari, Bajitpur, London (U.K.) Cove & John (Guyana). Felicity (Trindad). Toronto (Canada). New York (U.S.A.)

Head Office :

211, Rash Behari Avenue,
Kolkata - 700 019.
Phone : 2440-5178/2327
Fax : 2440-2328
E.mail – bharatsevashram@rediffmail.com
bss_ho@vsnl.net

Ref. No........................ Dated 200

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের অপার করুণায় আমার স্নেহাস্পদ স্বামী যুক্তানন্দ উপনিষদের উপাখ্যানমূলক উপদেশগুলির সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী দিয়ে "উপনিষদের গল্পগুচ্ছ" নামে বই লিখেছে শুনে অশেষ প্রীতিলাভ করলাম।

আশাকরি, বইটির এই নূতন বৈশিষ্ট্য পাঠক, সাধারণকে স্বামী প্রণবানন্দজীর সম্পর্কে নূতন ভাবনা যোগাবে। বইটি ঘরে ঘরে নিত্যপাঠ্য হোক ও যুক্তানন্দকে শ্রীশ্রীঠাকুর আশীর্ব্বাদ দান করুন — এই প্রার্থনা।

ইতি
নিত্যশুভানুধ্যায়ী
স্বামী শ্রীদীপ্তানন্দ
সভাপতি
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
ও
শ্রীশ্রীপ্রণব-মঠ

ওঁ

উপনিষদের উপদেশমূলক উপাখ্যান ও উপনিষদের মূর্ত প্রতীক যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের বাণীর সম্মিলনে "উপনিষদের গল্পগুচ্ছ" ছোট্ট গ্রন্থটি স্বামী যুক্তানন্দ প্রকাশ করছে জেনে সুখী হলাম।

গ্রন্থটি বহুল প্রচারিত হোক—এই কামনা।

ইতি—

নিত্য শুভানুধ্যায়ী

স্বামী বুদ্ধানন্দ

(স্বামী বুদ্ধানন্দ)

প্রধান সম্পাদক

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

শুভাশীর্বাদ

সনাতন হিন্দুধর্ম, হিন্দু-সংস্কৃতি মানুষকে করে উদার, করে সঙ্কীর্ণতামুক্ত, করে বিশ্বসৌভ্রাতৃত্বে আস্থাশীল ; শেখায় জীবমাত্রকেই শিবজ্ঞানে ভালবাসতে, শেখায় নরমাত্রই নারায়ণ বলে বুঝতে, শেখায় যেখানে নারী সেখানেই তাকে গৌরীরূপে ভাবতে।

ওই উদার, মুক্ত ও মহান্ ভাবনা হিন্দুধর্ম, হিন্দু-সংস্কৃতিতে এল কোথা থেকে? এসেছে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার দেশ এই ভারতবর্ষের চিরগৌরবময় আর্যঋষিদের কঠোর তপঃসাধনার বিশুদ্ধ ফলরূপে। তাঁরা সেই ঋষি—যাঁরা দুবাহু ঊর্ধ্বে তুলে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—শোনো শোন বিশ্ববাসী, তমসার পরপারে অবস্থিত সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমরা জেনেছি, যাঁকে জানলে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে এবং যাঁকে জানা ছাড়া মানুষের পরমার্থলাভের অন্য কোন উপায় নেই।

সেই দিব্যদ্রষ্টা ঋষিদেরই সৃষ্ট বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রই হিন্দুধর্মে ও হিন্দু-সংস্কৃতিতে ওই মহান্ ভাব, ওই মহতী ভাবনা, ওই সুউচ্চ আদর্শের সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র দেশে, এমন-কি সমগ্র বিশ্বেই ওই সুমহান্ আদর্শকে আরও বেশী প্রচারিত ও প্রসারিত করার প্রয়োজন আজ এসেছে। অন্যথায় সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, অনৈক্য ও কলহলিপ্ত বিশ্ব-মানবের মানব-জীবনের সার্থকতা, তাদের ব্যক্তিগত,

পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শান্তি, সাম্য ও কল্যাণের বিকল্প পন্থা কোথায়?

তাই সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই উপনিষদের আলোকে সমুদ্ভাসিত দিব্যজীবন যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর কৃপাশীর্বাদধন্য ও আমার স্নেহাস্পদ স্বামী যুক্তানন্দজী "উপনিষদের গল্পগুচ্ছ" রচনা করেছেন। গ্রন্থটি উপনিষদেরই কতকগুলি উপাখ্যানের সমাহার হলেও তা থেকে জনসাধারণ যে উপনিষদীয় ভাবনা পেতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। গ্রন্থখানি পাঠ করে পাঠকগণ যে উপকৃত হবেন তাও নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ্রন্থটি সকলের নিকটই সাদরে গৃহীত হোক—এই শুভকামনা করি। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি তিনি স্বামী যুক্তানন্দজীকে তাঁর এ-কাজে আরও শক্তি দিন।

ইতি—

নিত্যশুভানুধ্যায়ী

স্বামী অশোকানন্দ

যুগ্ম-সম্পাদক

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

ও সম্পাদক

প্রণব এবং প্রকাশ বিভাগ

প্রাক্-কথন

"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"

পরিবর্তনশীলতাই সংসারের স্বভাব, নতুবা প্রাচীনকাল থেকেই যুগ, যুগান্তর ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত হ'ল কেন? সমাজের ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে কখনও ধীর, কখনও বা দ্রুত গতিতে, জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। উন্মুক্ত প্রান্তরে ক্রমশই জনবসতি ও নানা যন্ত্রশিল্প গড়ে উঠছে। শান্ত-স্নিগ্ধ আশ্রমের স্থানে নির্মিত হয়ে চলেছে বিশাল আয়তনের কোলাহল-মুখরিত কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। গুরু-শিষ্যের মধ্যে সম্পর্কও যাচ্ছে পাল্টে। বাঁচার আড়ম্বর এখন বিরাট, বিচিত্র ও জটিল। এই যুগে দাঁড়িয়ে তাই আজ থেকে কমপক্ষে ত্রিশ শতাব্দী আগে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করা প্রায় দুষ্কর। তবে অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমাদের কাছে রয়েছে সেই যুগের বিশাল সাহিত্য যা 'বেদ-উপনিষদ' নামে প্রসিদ্ধ।

বৈদিক যুগের মানুষেরা বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে কবিতায় ও গানে স্তব-স্তুতি নিবেদন করতেন, আগুন জ্বেলে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেন নানা হব্যদ্রব্য। কিন্তু তারই মাঝে তাঁদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিল—এই জগৎ কোথা হতে এসেছে? কে এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা? এই পৃথিবী যে-দিন ধ্বংস হবে সে-দিন যাবে কোথায়? আমার মৃত্যুর পরে আমি কি সত্যিই কোথাও কোনভাবেই কোন অবস্থাতেই কোন রূপেই থাকব না? চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাব আমি বিশ্ব থেকে? জগতে কি সত্যিই চিরস্থায়ী বলে কিছুই নেই? পৃথিবীর এত বহুত্বের মূলে এক বলে কিছু নেই? এত দেবতাদের উপরে প্রভুত্ব ক'রার মতো সর্বাধিনায়ক কেউ কি সত্যিই নেই?

এই-সব প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে-যুগের অগ্রণী পুরুষদের অন্তর। সাধারণ জনের কাছে হয়তো এই-সব প্রশ্নের কোন অর্থ নেই। আহার-নিদ্রা ছাড়া আমরা কিছু ভাবি না। আমাদের কাছে মনে হয় অন্তর উপবাসী থাকে থাক, অনাহারে বা অপুষ্টিতে সে মারা যায় যাক, আমরা এসেছি জগতে ভোগ করতে, তাই যে-কোন উপায়ে বা কৌশলে যত পারি ভোগ করে যাই, ঐ-সব সূক্ষ্ম চিন্তায় ও বিচারে কাজ কী আমার? কিন্তু আমরা তো ছাগ, কুকুর, শৃগাল, শূকর নই যে আহার-নিদ্রা ইত্যাদির মধ্যেই তৃপ্ত হব, আমরা যে মানুষ। তাই প্রশ্ন আমাদের উপর কেউ চাপিয়ে দেয় না, মনের মধ্যে নিজে থেকেই জেগে ওঠে। উত্তরের অনুসন্ধানও তাই করতে হয়। সে-যুগের মানুষ ব্যাকুল হয়ে উত্তরের অনুসন্ধান করতে করতে অন্তরের মাঝে যে সাড়া পেয়েছিলেন তা-ই বিবৃত হয়েছে ও বিধৃত রয়েছে বেদে, বিশেষ করে বেদের উপনিষদ অংশে।

বৈদিক যুগের ভাবনা অনুযায়ী তত্ত্ব স্বয়ং এসে ধরা দেয় উপযুক্ত অধিকারীর কাছে, আর সেই ব্যক্তি তত্ত্ব দর্শন করেন মাত্র। ঋষি হয়ে ওঠেন তিনি। ঋষি মন্ত্রের তাই স্রষ্টা নন, দ্রষ্টা মাত্র। সত্য সৃষ্টি করা যায় না, স্বয়ং কোন এক শুভক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মাত্র। 'উপনিষদ্' এই শব্দটির উৎপত্তির মূলেও আছে সম্ভবত সেই একই ভাবনা (উপ-নি-সদ্ + ক্বিপ্)। বেদে সদ্-ধাতুর অর্থ 'বসা'। এই বিদ্যা গুরুর কাছে এসে নিবিড়তর হয়ে বসে গ্রহণ করতে হ'ত বলে নাম উপনিষদ্ (বাংলায় শেষ বর্ণে হলন্তের চিহ্ন দেওয়া হয় না)। মন্ত্রবিদ্যাও আচার্যের কাছে গিয়েই গুরুগৃহে থেকেই অর্জন করতে হ'ত, কিন্তু উপনিষদ্-বিদ্যার জন্য আরো নিবিড় হয়ে বসতে হ'ত। নিবিড়তা এই কারণে যে, মন্ত্র অনেক শিষ্যকে একত্র বসিয়ে শেখানো যেত, কিন্তু উপনিষদ-বিদ্যা শেখানো হ'ত নির্বাচিত ছাত্রকেই। সমাজে তাই মন্ত্রবিদ অনেক ছিলেন, কিন্তু আত্মবিদের সংখ্যা ছিল বিরল। আমরা গ্রন্থের মধ্যেই দেখি আচার্য উপনিষদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন একজন মাত্র অথবা বিশেষ কয়েকজন শিষ্যের কাছেই। উপনিষদ্ রহস্যবিদ্যা বলেই তার

আলোচনায় এই বিশেষ রীতি ও ব্যবস্থা। আবার বৈদিক ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলা যায়, যে বিদ্যা স্বয়ং উপযুক্ত অধিকারীর কাছে এসে তার হৃদয়াসনে বসে সেই বিদ্যাই উপনিষদ। হৃদয়াসনে বসার ফলে সেই অধিকারী যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিবর্তিত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী সদ্-ধাতুর তিন অর্থ—যাওয়া বা আসা, বিচূর্ণ বা বিনাশ করা, শিথিল করে তোলা। আচার্য শঙ্কর তাই বলেন, যারা এই বিদ্যার নিকটে এসে নিবিড়ভাবে অনুশীলন করে তাদের এই বিদ্যা ব্রহ্মের নিকট নিয়ে যায়, অবিদ্যা প্রভৃতি বন্ধন শিথিল করে দেয় এবং সংসারের দুঃখ বিনাশ করে বলে নাম উপনিষদ্। উপনিষদ্ তাহলে বিদ্যা এবং গৌণ অর্থে এই গূঢ়বিদ্যা যে-সব গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে সেগুলিও উপনিষদ্। বর্তমানে গ্রন্থ অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ বেশি হয়।

উপনিষদের সংখ্যা অনেক। যেগুলি মুখ্য উপনিষদ, বৈদিক যুগেই যেগুলির আবির্ভাব সেগুলি হ'ল—ঈশা, কঠ, কেন, কৌষীতকী, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য এবং শ্বেতাশ্বতর। এগুলির আবির্ভাব যে বৈদিক যুগেই ঘটেছিল তা বোঝা যায় ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং বৈদিক দেবতাদের নামের উল্লেখ থেকে। অপর পক্ষে বেদোত্তর যুগের উপনিষদগুলির মধ্যে বৈদিক ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না এবং সেগুলির মধ্যে বৈদিক দেবতাদের পরিবর্তে নানা পৌরাণিক দেব-দেবীর উপস্থিতি ঘটেছে। কৌতূহলী পাঠকেরা আরো পরবর্তী কালে রচিত অল্লোপনিষদ এবং খ্রীষ্টোপনিষদেরও সন্ধান পাবেন। যাই হোক, মূল উপনিষদগুলি গদ্যে, পদ্যে অথবা গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে পরিবেষিত হয়েছে। অধিকাংশ উপনিষদই হচ্ছে গুরু-শিষ্য-সংবাদ, শিষ্য প্রশ্ন করছে এবং গুরু তার উত্তর দিচ্ছেন। কোথাও বা শিষ্যের অভিপ্রায় বুঝে গুরুই কেবল উপদেশ দিয়ে চলেছেন।

উপনিষদের মূল তত্ত্ব আবর্তিত হয়েছে আত্মা ও ব্রহ্মকে ঘিরে। 'আত্মা' শব্দের স্থূল অর্থ স্বয়ং, নিজে, আমার ভিতরের আমি। আমার

মধ্যে যেমন এক গভীরের আমি আছে, তেমন বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যেও নিজ নিজ আমি আছে। বিশ্বব্যাপ্ত সেই আমি হচ্ছে 'ব্রহ্ম'। বৃহং বলেই তা ব্রহ্ম। আমার নিজের আমির সকল বহিরঙ্গ ত্যাগ করলে এবং বিশ্বগত আত্মার সকল আপাত বৈশিষ্ট্য বর্জন করলে দেখতে পাব দুই আত্মাই এক। উপনিষদের ঋষি তাই বলেছেন 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম' (এই আত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আমি অভিন্ন), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি হচ্ছি ব্রহ্ম), 'তত্ ত্বম্ অসি' (তুমি হচ্ছ সেই পরম আত্মা)। উপনিষদের সাধনা এই অভেদ-দর্শনেরই সাধনা। বিশ্বে ও আমাতে যে কোন ভেদ নেই, বিশ্ব যে আমারই সত্তার অপর অংশ তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অসৎ কর্ম হতে নিবৃত্ত হতে হবে, চিত্তের চাঞ্চল্য দমন করতে হবে, হতে হবে একাগ্র এবং শান্ত মনস্ক। চাই ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ, দান, দয়া, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান ও সত্যপালন। ত্যাগ করতে হবে সকল প্রকারের ছলনা এবং মিথ্যা। শ্রেয়কে স্থান দিতে হবে প্রেয়ের উপরে। পরম দেবতায় এবং আচার্যের প্রতি থাকা চাই পরম ভক্তি। শুধু বেদাধ্যয়ন এবং মেধা দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। যেমন সকল জলই জল, সকল পাখীই পাখী, সকল মানুষই মানুষ, তেমন সকল আমিই আমি, সকল অস্তিত্বই সত্তা। সত্তায় সত্তায় কোন ভেদ হতে পারে না, বাইরের অলঙ্করণ ও পরিচ্ছদ যাই হোক।

ব্রহ্ম কেবল বিশ্বের স্রষ্টা নন, তিনি বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে উপস্থিতও। তাহলে তাঁকে দেখতে পাই না কেন? নুন-মেশানো জলে যেমন নুনকে পৃথক করে চোখে দেখা যায় না, কেবল আস্বাদনের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হয়, তেমন ব্রহ্মকেও উপলব্ধি করতে পারা যায়, কিন্তু ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা যায় না। তিনি সকল ইতিভাবনার ঊর্ধ্বে। বস্তুত সেই মহাসত্য কোন ব্যক্তিবিশেষ নয় বলে তিনি তুমি ইত্যাদি কোন কিছুই তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় এবং স্ত্রী অথবা পুরুষ নয় বলে এই দুই লিঙ্গের কোনটিই তার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা চলে না। ব্রহ্ম তাই নপুংসক (= ক্লীব)-লিঙ্গ এবং তাঁকে নির্দেশ করতে হলে 'তৎ' (তাহা) বলতে হয়। ব্রহ্মের সকল বিশেষণ তাই ক্লীবলিঙ্গের। মনুষ্যত্ব

সম্বন্ধে যেমন তিনি, তুমি ইত্যাদি বলা চলে না, সেই পরম সত্তার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই। মনুষ্যত্ব যেমন পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়, পরম সত্তা বা ব্রহ্মও তা-ই।

খাপের মধ্যে তরোয়াল থাকলে যেমন তরোয়ালকে দেখা যায় না, কেবল খাপই দেখা যায়, তেমন আমাদের অন্তর্নিহিত আমিকে আমরা দেখতে পাই না, কারণ তা পাঁচটি খাপে ঢাকা। এই পাঁচটি খাপ হ'ল অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় বা জ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। আমার অন্নপুষ্ট দেহ, শ্বাস-প্রশ্বাসময় অস্তিত্ব, মননশীল অস্তিত্ব, জ্ঞানময় অস্তিত্ব এবং আনন্দময় অস্তিত্ব—এগুলির কোনটিই প্রকৃত আমি নয়, আমির আবরণ মাত্র। আনন্দময় অবস্থারও ঊর্ধ্বে যে আমি সেই আমিই হচ্ছে আমার যথার্থ আমি। ঠিক তেমনই শয়নে (সুষুপ্তি), স্বপনে ও জাগরণে যে আমির অস্তিত্বকে আমরা প্রত্যহ অনুভব করি সেই আমি আমার প্রকৃত আমি নয়, আমার সূক্ষ্ম, স্থূল ও স্থূলতর আমি। যে আমি সুষুপ্তিরও অর্থাৎ স্বপ্নশূন্য গাঢ় নিদ্রারও ঊর্ধ্বে অনুভূত হয় তা-ই আমার প্রকৃত আমি। চতুর্থ স্তরে অবস্থিত বলে তা তুরীয় চেতনা।

ব্রহ্ম কোন ব্যক্তিবিশেষ বা বস্তুবিশেষ নয় যে তাকে আমরা কোন এক বিশেষ স্থানে খুঁজে পাব অথবা কোন এক বিশেষ দিকে তাকিয়ে প্রণাম করব। আকাশের মতোই তা শরীরবিহীন, রূপহীন ও সর্বব্যাপী। জগৎ ত্যাগ করে ব্রহ্মকে পেতে হয় না। জগৎ বা কোন-কিছুকে ত্যাগ করা মানে সেখানে ব্রহ্মের উপস্থিতি অস্বীকার করা। তা-তে ব্রহ্মের মাহাত্ম্য খর্ব করা হয়, তার সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদা অস্বীকারই করা হয়। তাহলে কি এই জগৎকে পরম সত্য বলে আমরা জড়িয়ে ধরব? না, তা নয়। জগতের প্রতি আমার জোঁকের মতো যে নিদারুণ আসক্তি তা ত্যাগ করতে হবে। জগৎ যেমন দেখছি সেইটাই তার আসল রূপ, জগৎ আমার ভোগের বস্তু, অন্যে আমার ভোগের পথে কাঁটা এই দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে হবে। তুষকে ছাড়িয়ে যেমন চাল বার করে নিতে হয়, তেমন জগতের বাইরের নাম-রূপময় পোষাকটি খুলে

নিয়ে তাকে ব্রহ্মময় বলে দেখতে হবে, কারণ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই সবই সত্য সত্যই ব্রহ্ম। 'ধাতুপ্রসাদ' অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহ অথবা আমার জৈব উপাদানগুলির স্বচ্ছতা এলেই আমি সেই পরম বিস্ময়কর ও শিহরণ-জাগানো সত্যটি যেন চোখে দেখার মতোই দেখতে পাব। তাই হে শ্রেষ্ঠ, হে সৌম্য, হে অমৃতের পুত্র, ওঠ, জাগো, হৃদয় দিয়ে বোঝ উপনিষদের অমৃতময়ী অভয়বাণী। ওহে অবোধ চিত্ত, লহ, কহ, গাহ আর ভজ ব্রহ্মের নাম। কোথায়? জনসমাজে? না, আপন হৃদয়মাঝারেও।

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, কবীন্দ্র রবীন্দ্র প্রভৃতি মনীষী উপনিষদের পাঠে পরম লাভবান হয়েছেন। বিদেশী মনীষীরাও উপনিষদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। ডয়সেন (Deussen) বলেছেন, উপনিষদে অস্তিতার অন্তিম রহস্যের উপর নিবিড়তম ও প্রত্যক্ষ আলোকসম্পাত ঘটানো হয়েছে ("The most intimate and immediate light upon the last secret of existence")। দার্শনিক সোপেনহাউয়ের (Sehopenhauer)ও বলেছেন—-যে প্রায় অতিমানবীয় চিন্তার নিদর্শন আমরা এখানে পাই তার প্রবক্তাদের কেবল মানুষমাত্র বলে ভাবা যায় না। ("almost superhuman conceptiors whose originators can hardly be regarded as mere men")। উপনিষদ সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে পরিতৃপ্তি-প্রদানকারী ও সমুন্নতি-সাধনকারী পাঠ্যগ্রন্থ যদি কিছু থাকে তা এই উপনিষদই। এই গ্রন্থ তাঁকে জীবনে দিয়েছে সান্ত্বনা, মরণেও তা বহন করে আনবে সান্ত্বনা ("It is the most satisfying and elevating reading which is possible in the world ; it has been the solace of my life and will be the solace of my death")। আমরাও যদি তাই উপনিষদের অনুশীলন করি তাহলে আমাদের প্রয়াসও নিশ্চয়ই নিষ্ফল হবে না।

উপনিষদ যেমন দর্শন, তেমন তা আবার উত্তম কাব্যও। উপনিষদগুলির মধ্যে তাই দেখতে পাই নানা সুন্দর উপমা, রূপক এবং অনেক আকর্ষণীয় গল্প। গল্প শুরুর সময়ে আমরা বুঝতে পারি

না যে, হঠাৎ তত্ত্বের মাঝে গল্প এল কেন? কিছু দূর এগোলে ধরা পড়ে গল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তত্ত্বকে সহজে ও অজ্ঞাতে মনের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার জন্যই সেগুলির অবতারণা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উৎসাহী যুবক সন্ন্যাসী স্নেহাস্পদ যুক্তানন্দজীর লক্ষ্য সাধারণের মাঝে উপনিষদের অমৃতময়ী ও উদাত্ত বাণী ছড়িয়ে দেওয়া, গেঁথে দেওয়া। তিনি তাই গ্রন্থ-রচনায় গল্পগুলিকে বেছে নিয়ে উচিত কাজই করেছেন। তিনি আরও মনে করেছেন যে, কেবল গল্পের অনুবাদ করে দিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই স্বামীজী গল্পের পরিবেষণায় সামান্য কিছু তুলির টানও দিয়েছেন। সাধারণের কাছে গল্পগুলি তাই আরও উপভোগ্য হয়ে উঠবে বলে মনে করি।

উদাত্ত বাণী গ্রহণের উপযুক্ত সময় যতক্ষণ মানুষ বালক-বালিকা থাকে অথবা অন্তর বালকের মতো সরল ও বিদ্বেষ-বিমুক্ত থাকে তখনই। নচিকেতা ও সত্যকামকে উপনিষদের মহতী বাণী প্রদান করা হয়েছে যখন তারা বালক ছিল। গল্পের প্রতি আকর্ষণ অবশ্য মানুষের সব বয়সেই থাকে। তাই যে উদ্দেশ্য নিয়ে স্নেহাস্পদ যুক্তানন্দজী 'উপনিষদের গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠারই কথা। লেখক গল্পের শেষে যেভাবে স্বামী প্রণবানন্দজীর বাণীগুলির সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, তাতে যাঁরা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর দিব্যজীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে জানেন, তাঁরা তাঁর সেই শুদ্ধ জীবনে উপনিষদের আলোক যে কতখানি প্রতিভাত, আশাকরি তা অনুভবে সমর্থ হবেন। গ্রন্থটির প্রতি বহুজনে আকৃষ্ট হয়ে উঠুক এবং স্বামীজীর মূল উদ্দেশ্য সফল হোক—এই আন্তরিক কামনা রইল।

"য এতদ্ বিদুর্ অমৃতাস্ তে ভবন্তি"

ড. অমর কুমার চট্টোপাধ্যায়
অতিথি অধ্যাপক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—সংস্কৃত বিভাগ)
কোলকাতা-৭০০ ০২৭ প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (আশুতোষ কলেজ)
৩১-১০-২০০৫ প্রাঃ অংশকালীন অধ্যাপক (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

গ্রন্থকারের কথা

উপনিষদ নিঃসংশয়ে ব্রহ্মবিদ্যা। যে বিদ্যা মানবনিবহকে অবিদ্যার আবরণ থেকে মুক্ত করতে শোনান — ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। অর্থাৎ সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। উত্তম ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন কর। কারও ধনে লোভ করো না বা আকাঙ্ক্ষা করো না, কারণ ধন আবার কার? —যে বিদ্যা সর্বব্যাপী পুরুষকে জানার সংবাদ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন এবং জানলেই দূরতিক্রম্য মৃত্যুকেও অতিক্রম করার প্রতিশ্রুতি দেন— যে বিদ্যা সেই পরমেশ্বরকে সব থেকে উৎকৃষ্ট বা সব থেকে অপকৃষ্ট এবং মহত্তর বা অণুতর বলে বর্ণনা করেন— যে বিদ্যা অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের মত নিশ্চলভাবে নিজ প্রকাশাত্মক মহিমায় বিরাজিত বলে প্রমাণ করতে পারেন— যে বিদ্যাই একমাত্র মানুষের একান্ত করণীয় ব্রহ্মোপলব্ধির, আত্মোপলব্ধির জন্য প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করেন, বুঝিয়ে দেন এই জগৎ ও এই জীবের সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্বকথা, উন্মোচন করেন বাক্যমনাতীত অতিজাগতিক রহস্যকে, যে বিদ্যা আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহটির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বের উন্মোচন করে বুঝিয়ে দেন এই দেহের অধিপতি কে— কি তাঁর স্বরূপ— কোথায় তাঁর অবস্থান ইত্যাদি অতি গহন বার্তা। সেই বিদ্যা যে অতীব দুর্গম, অতীব গম্ভীর, অতলস্পর্শী ও দুস্তর সেই নিয়ে কোন প্রশ্ন, কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না। যেজন্য যুগে যুগে এই ব্রহ্মবিদ্যা বা উপনিষদের বক্তাও যেমন দুর্লভ, শ্রোতাও তেমনি দুর্লভ।

কিন্তু বিশ্বমানবের এই অতি গম্ভীর ও জটিল তত্ত্বের যে সারবার্তা — 'আত্মানং বিদ্ধি' তাকেই জীবনে বাস্তবায়িত করতে না পারা পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর এই দূরতিক্রম্য চক্র থেকে কারও নিস্তার নেই — একথা সত্য, অবিতথ সত্য। সেজন্য যুগে যুগেই উপনিষদের গর্ভস্থিত যে সাধন রহস্য বা পরমব্রহ্মকে নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করার উপায়টি জগৎবাসীর কল্যাণে প্রচারিত, প্রসারিত করে দিতে জগতে অবতীর্ণ অনেক অবতার, আচার্য, যোগী, ঋষি, মুনি ও জ্ঞানীজন। তাঁদের করুণায় কোন কোন ভাগ্যবান উপনিষদীয় পথ অনুসরণের মধ্য দিয়ে দুস্তর ভবার্ণবের যাত্রা শেষ করে, সেই জ্যোতির্ময় পরমপুরুষকে লাভ করে জীবন সার্থক করেন, সুন্দর করেন।

পরমপুরুষের অনন্ত করুণাধন্য অবতার ও আচার্যগণ ব্যতীত যে সকল জ্ঞানীজন উপনিষদের বার্তা জনসমাজে প্রচারে আজও রত এই গ্রন্থকার তাঁদের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার অধিকারী কোনওভাবেই নয়। সেই জ্ঞানেরও সে অধিকারী নয়। তবুও সেই পরমেশ্বর যিনি যুগাচার্যরূপে জগতে অবতরণ করে উপনিষদের

আলোর প্রতি মর্ত্যবাসীকে আকৃষ্ট করেছেন, বা করতে চাইছেন হয়তো তাঁরই ইচ্ছায় এক ক্ষুদ্র আকাঙক্ষা-বিন্দু ভ্রমে অন্তরে জাগ্রত হয়— যদি কোন ভাবে উপনিষদের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। এবং সেই আকাঙ্ক্ষারও পূরণ তাঁরই ইচ্ছায় হওয়ায় "উপনিষদের গল্পগুচ্ছ" শিরোনামে ক্ষুদ্রগ্রন্থটির আত্মপ্রকাশ।

গ্রন্থটিতে বিভিন্ন উপনিষদের উপাখ্যানগুলি ও তা'তে যে সাধন-রহস্যের কথা বলা হয়েছে তাই যথাসম্ভব সরল ভাষায় এবং গল্পাকারে বলারই চেষ্টা হয়েছে। পরন্তু গল্পগুলির শেষে উপনিষদ্‌ময় মহাজীবন যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর বাণীগুলিকেও সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি অবশ্যই গ্রন্থটির একটি বিশেষত্ব। সে চেষ্টাও মহত্তর উদ্দেশ্যেই। উদ্দেশ্যটি— যাঁরা স্বামী প্রণবানন্দজীকে জানেন, জানেন তাঁর কর্মধারা, তাঁরা তা থেকে বুঝবেন যে সে জীবনটী কতখানি উপনিষদের দিব্য আলোকে সমুজ্জ্বল। পরন্তু তাঁরা তাঁকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবারও প্রেরণা পাবেন — যা ছিল পূজ্য শ্রীমৎ স্বামী নির্ম্মলানন্দজী মহারাজের একান্ত অভিপ্রেত। প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থে প্রচলিত উপনিষদ্‌গুলির বাইরেও কোন কোন উপনিষদের গল্পও দেওয়া হয়েছে। কারণ, উপনিষদ্ অর্থই যদি বিদ্যাবিশেষের সারাংশ বা রহস্য বিদ্যা হয়ে থাকে, পরন্তু তা যদি আত্মমুক্তি, ব্রহ্মোপলব্ধির পথ নির্দেশক হয়ে থাকে — সেই বিবেচনা করেই।

গ্রন্থটিতে জ্ঞানতপস্বী শ্রদ্ধেয় ডঃ অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মুখবন্ধ গ্রন্থটির মর্যাদাকে যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। পরন্তু তাঁর সহযোগিতা ও পরামর্শ পেয়ে বিশেষভাবেই উপকৃত হয়েছি। সে-জন্য আমি তাঁর নিকটও চিরকৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি গ্রন্থের প্রকাশক আমার অগ্রজ সঙ্ঘভ্রাতা স্বামী সারস্বতানন্দজী, আর্থিক সহায়তাদানকারী ধর্মনগর (নয়াপাড়া কালীবাড়ীর বিপরীতে) ত্রিপুরার শ্রীকাজল বণিক ও মুদ্রাকর শ্রীসুমিত সরকারের কাছে।

পরিশেষে একথাই বলি — যদি গ্রন্থটি পাঠে পাঠক-সাধারণের অন্তরে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ উপনিষদের প্রতি বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ অনুভূত হয় এবং উপনিষদের সঙ্গে স্বামী প্রণবানন্দজীর সম্পর্ক কোথায় তা অনুসন্ধানের আকাঙক্ষা জাগে, তবে আমি আমার-শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বিনীত —

গ্রন্থকার

ঋণ স্বীকার ঃ-

১। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী-স্বামী গম্ভীরানন্দ
২। উপনিষৎ নবক-অতুল চন্দ্র সেন
৩। উপনিষদ্ সংগ্রহ-চিত্তরঞ্জন ঘোষাল
৪। শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতা

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	নচিকেতা	০১
২।	দ দ দ	১৫
৩।	যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ	১৮
৪।	কলিতে নামেই মুক্তি	২৪
৫।	ইন্দ্রের আত্মজ্ঞান লাভ	২৮
৬।	শ্রদ্ধাবান জানশ্রুতি	৩৭
৭।	ব্রহ্মিষ্ঠতম যাজ্ঞবল্ক্য	৪২
৮।	সত্যকাম জাবালের সত্যনিষ্ঠা	৪৯
৯।	রথের উপর বামন দেখা	৫৩
১০।	বিশ্বমাঝে চলছে শুধু আত্মারই লীলা	৫৮
১১।	ঋষি দুর্বাসা ও গোপিগণ	৬৮
১২।	ত্বৎ-ত্বম-অসি	৭২
১৩।	প্রাণের খেলা	৭৮
১৪।	ব্রহ্মাই শক্তিমান	৮৬
১৫।	ঋষি চক্রায়ণ উষস্তি	৯৩
১৬।	রাজা জনকের জ্ঞান-পিপাসা	৯৯
১৭।	কয়েকটি বিশেষ শব্দ ও তার অর্থ	১০৭

নচিকেতা

আজ থেকে অনেক দিন আগের কথা। বাজশ্রবস্ নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল নচিকেতা। মুনি এক সময় বিশ্বজিৎ নামে যজ্ঞ করেছিলেন। ওই যজ্ঞ করার কারণ, যজ্ঞ ঠিকমত হলে স্বর্গলাভ অনিবার্য। কিন্তু ওই যজ্ঞ সফল করতে হলে সবকিছুই দান করতে হয়। এমনকি নিজের অতি প্রিয় বস্তুকেও। তাই মুনি বাজশ্রবসও সেইভাবেই যজ্ঞের আয়োজন করে যজ্ঞ করছেন।

যজ্ঞ শেষ হয়ে গেলে ঋত্বিক ও সদস্যদের দক্ষিণা দেওয়ার বিধি আছে। যাঁরা ব্রতী হয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন তাদের নাম ঋত্বিক। আর যাঁরা যজ্ঞের কাজ ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে কি-না তা দেখেন তাঁদের বলা হয় সদস্য। এই ঋত্বিক ও সদস্যদের দক্ষিণা না দিলে এত খরচ করে যজ্ঞ করেও তা কিন্তু নিষ্ফলই হয়ে যায়। তাই ঋষিও সেই ভাবেই যজ্ঞশেষে দানের আয়োজন করেছেন। দানের কাজও শুরু করেছেন। তাঁর সেই দান-সামগ্রীর মধ্যে যে-সকল জিনিস আছে তার মধ্যে আছে অনেকগুলি গাভীও। কিন্তু গাভীগুলির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। সেগুলি বুড়ো হয়ে গেছে। ঠিক মত ঘাস বা খড় খেতে পারে না। জল খেতে পারে না। তাদের আর সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নেই। দুধ দেওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার। গাভীগুলির ওইরকম অবস্থা দেখে ঋষির পুত্র নচিকেতা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। যদিও তিনি বয়সে অল্প— তবুও শাস্ত্রজ্ঞানী, পিতৃভক্ত, শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী, ব্রহ্মচারী। তাই তাঁর মনে হল—ওই রকম দুর্দশাগ্রস্ত গাভীগুলি নিয়ে কোন ঋত্বিক ও সদস্যগণ সন্তুষ্ট হতে পারেন না। আর তাঁরা যদি সন্তুষ্ট না হন তাহলে পিতার এত শ্রম, এত আয়োজন সবই নিস্ফল হয়ে যাবে। স্বর্গপ্রাপ্তি তো অসম্ভব ব্যাপার। বরং তিনি অধোগতি প্রাপ্ত হবেন। আমি যেহেতু তাঁর সন্তান সুতরাং আমার প্রাণ দিয়ে হলেও পিতার অনিষ্ট যাতে না হয় তা দেখা উচিত। আর পিতা

যেহেতু বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করছেন তখন তাঁর আমাকেও দান করা কর্তব্য। কারণ পুত্র তো পিতারই সম্পত্তি।

এসব কথা ভেবেই নচিকেতা তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—পিতা আমাকে দক্ষিণারূপে কোন্ ঋত্বিককে দান করবেন? নচিকেতার প্রথমবারের জিজ্ঞাসায় ঋষি কোন উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বার তিনি সেই একই কথা বলা সত্ত্বেও ঋষি কোন উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বারও নচিকেতা সেই একই কথা বলায় ঋষি নচিকেতার বালকের মত ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে বলে ফেলেন—তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করলাম।

পিতার মুখে নচিকেতা এমন কথা শুনে ভাবতে লাগলেন—পিতা নিশ্চয়ই আমার উপর রেগে গেছেন। কিন্তু তাঁর আমার উপর এমন রাগের কি কারণ থাকতে পারে? সাধারণতঃ লোকে যারা শিষ্ট নয়, যারা অবাধ্য বা যারা অযোগ্য সেরকম পুত্র বা শিষ্যের উপরই অসন্তুষ্ট হন—রেগে যান। সেরকম সন্তান বা শিষ্যকেই তাঁরা যমের বাড়ি যেতে বলেন। কিন্তু আমি তো পিতার বহু সন্তানের, বহু শিষ্যের মধ্যে গুরুসেবায় এবং শিষ্টাচারে সবচেয়ে উত্তম। আর যদি উত্তম নাও হয়ে থাকি তবে মধ্যম তো নিশ্চয়ই, কিন্তু অধম কখনওই নই। তা সত্ত্বেও পিতা আমাকে যমের বাড়িতে পাঠাতে চাইছেন কি কারণে? আমাকে দিয়ে যমের এমন কোন্ প্রয়োজন সফল হবে? নিশ্চয় পিতা কোন প্রয়োজনের কথা না ভেবেই আমাকে যমালয়ে যেতে বলেছেন। যা হোক, পিতা যখন আদেশ করেছেন তখন তা আমি অবশ্যই পালন করব।

তারপর নচিকেতা আরও ভাবেন—আমি যমালয়ে চলে যাওয়ায় পিতা যদি পুত্রবিয়োগের কারণে দুঃখ পান বা যেতে অনুমতি না দেন তাহলে তো তিনি সত্যভ্রষ্ট হবেন। কারণ, যে জিনিস একবার দান করে দেওয়া হয়, তাকে তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তাই তিনি পিতাকে বললেন—আপনার যাঁরা পূর্বপুরুষ তাঁরা কি রকম

আচরণ করেছেন তা চিন্তা করে দেখুন। বর্তমানকালে সাধু-সজ্জনগণেরা কি রকম আচরণ করছেন তাও ভেবে দেখুন এবং তাদের আপনি অনুসরণ করুন। এই সংসারে মানুষের জীবন অনিত্য। ক্ষণস্থায়ী। মানুষ শস্যের মত বারবার জন্মায় ও মরে। সেজন্য মানুষের জীবনের অনিত্যতা স্মরণ করে পূর্বপুরুষ ও বর্তমান সাধুসজ্জনগণের পথ অনুসরণ করে আমার বিরহে শোক করবেন না। আমাকে যমালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে আপনার কথার মর্যাদা রক্ষা করুন।

এই সমস্ত কথা বলে পিতাকে বুঝিয়ে নচিকেতা তাঁর অনুমতি নিয়ে যমরাজের ভবনে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন যমরাজ বাড়িতে নেই। তিনি যমের বাড়িতে ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে রইলেন। তাঁর স্নান, খাওয়া ঘুম সবই দূরে গেল। তিনদিন পর রাজা যম বাড়িতে ফিরে এলেন। বাড়ির ঝি-চাকর ও আত্মীয়-স্বজনদের মুখে শুনলেন ব্রাহ্মণকুমার নচিকেতার বাড়িতে আসার কথা। শুনেই তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে যান। গিয়ে দেখেন ব্রাহ্মণ-সন্তান, পূর্ণ ব্রহ্মচারী, সর্বাঙ্গ যেন আগুনের মত জ্যোতির্ময় নচিকেতা তাঁর দরজার সামনে বসে। সঙ্গে সঙ্গে যম নচিকেতার পা ধোয়ার জল, বসার জন্য আসন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—যে গৃহস্থের বাড়িতে ব্রাহ্মণ অনাহারে থাকেন সেই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের আশা, প্রতীক্ষা, তার সাধুসঙ্গ, তার প্রিয় কথা বলা, তার যজ্ঞ করা, কূপ ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কাজে কোন পুণ্য হয় না। পরন্তু ব্রাহ্মণের অনশনের পাপে তার পুত্র ও পশু সবই নষ্ট হয়ে যায়।

যম নচিকেতাকে এ-কথা বলেই বললেন—হে ব্রাহ্মণ! তুমি আমার অতিথি এবং ব্রাহ্মণ। সেজন্য আমার নমস্কারের যোগ্য। তোমাকে প্রণাম করি, আমার যেন মঙ্গল হয়। যেহেতু তুমি আমার বাড়িতে তিনরাত্রি অনাহারে ছিলে সেজন্য তিন দিনের তিনটি বর তুমি প্রার্থনা কর।

যমের প্রতিশ্রুতি শুনেই পিতার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাশীল নচিকেতার প্রথমেই মনে হয় পিতারই কথা। কারণ সন্তান এসেছে যমালয়ে। সুতরাং তাঁর মনে নিশ্চয়ই অশেষ দুঃখ ও তিনি অনেক কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। তাই নচিকেতা যমের কাছে প্রথমেই প্রার্থনা করলেন—পিতার চিত্ত যেন প্রসন্ন হয়। তাঁর ক্রোধ যেন দূরীভূত হয় এবং যখন তোমার এই আলয় থেকে আমি পিতার কাছে ফিরে যাব, তখন যেন তিনি আমাকে প্রেতমূর্তি ভেবে ভয় না পেয়ে আমার কথা তাঁর স্মরণে আসে এবং তিনি আমাকে চিনতে পেরে আগের মতই সাদর সম্ভাষণ করেন।

যমরাজ নচিকেতার প্রথম বরের প্রার্থনা শুনে বললেন—তোমার পিতা অরুণপুত্র উদ্দালক তোমার প্রতি আগে যেমন স্নেহময় ছিলেন, আমার আদেশে তোমাকে চিনতে পেরে তিনি ঠিক তেমনই প্রীতিসম্পন্ন হবেন। তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরতে দেখে তাঁর সব রাগ দূর হবে ও আগামী সমস্ত রাত্রি তিনি সুখে নিদ্রা যাবেন।

নচিকেতা প্রথম বর পাওয়ার পর দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করে বললেন—হে মৃত্যুর দেবতা, স্বর্গলোকে রোগ-শোক-দুঃখ-অনশন-জরা কোন কিছুরই ভয় নেই, ভয় নেই মৃত্যুরও। এসবের জন্য মর্ত্যবাসী যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কষ্ট পান স্বর্গবাসীদের তাও পেতে হয় না। তিনি আরও বলেন—হে মৃত্যু, যে অগ্নির চয়ন করে লোকে স্বর্গে যায়, সেই অগ্নির বিষয়ে আপনি সবই জানেন। সেই বিদ্যা আমি জানতে আগ্রহী। আপনি আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন। যাঁরা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে যান তাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেন। সেজন্য স্বর্গলাভের অভিলাষী হয়ে আমি দ্বিতীয় বরে স্বর্গলাভের সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।

যমরাজ বললেন—নচিকেতা, স্বর্গলাভ করার উপায় যে অগ্নিবিদ্যা তা আমি সম্যক্‌রূপেই জানি এবং সে বিষয়ে জেনেই তোমাকে বলছি। তুমি আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন। তুমি নিশ্চিত জানবে—এই

অগ্নিই অনন্তলোক অর্থাৎ অনন্তকাল ধরে স্বর্গলোক পাওয়ার উপায়, কারণ অগ্নিই প্রথমজাত শরীরী বা বিরাট পুরুষ। তাঁর থেকেই জগতের সৃষ্টি। এজন্য এই অগ্নিকেই জগতের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলা হয়েছে। এই বিরাট অগ্নি সাধারণ মানুষের মোটেই বোধগম্য নয় এবং এই অগ্নি যেমন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির গ্রাহ্য নয়, তেমনি মনের কোন বৃত্তি দিয়েও একে ধরা যায় না। একমাত্র যাঁরা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তাঁরাই তাঁদের বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্য দিয়ে সম্যক্ ভাবে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন।

যমরাজ আরও বলেন—অগ্নিই বৈশ্বানর বিরাট পুরুষ, প্রথম শরীর, তিনি সর্বজগতের আদি। অগ্নিচয়নের কতকগুলি বিধি আছে। অগ্নিতে হোম করার জন্য ইঁট দিয়ে যে বেদী বা কুণ্ড তৈরী করতে হয়, সেই বেদী বা কুণ্ড কীভাবে তৈরী করতে হয়, কীভাবে অগ্নি চয়ন করতে হয় প্রভৃতি বিষয়ে যমরাজ তাঁকে সুন্দরভাবে উপদেশ দিলেন।

যমের কাছে নচিকেতা অগ্নি-বিষয়ে উপদেশ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি যমকেই তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলে দেন। তা দেখে ও শুনে যম অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, নচিকেতা অত্যন্ত মেধাবী ও একাগ্রচিত্ত। যমরাজ নচিকেতার প্রতিভায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনটির অতিরিক্ত আরও একটি বর দিতে চাইলেন। সে বরটি ছিল— এই যে অগ্নির কথা তোমাকে বললাম, তা জগতে তোমারই নামে প্রসিদ্ধ হবে। অর্থাৎ ওই অগ্নি নাচিকেত অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ হবে। সেই সঙ্গে যমরাজ তাঁকে একটি বিচিত্র শব্দময়ী রত্নমালাও দিয়ে বলেন—যে লোক পিতা মাতা ও আচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্থাৎ তাঁদের উপদেশ মত অথবা বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টজনের আচরণ অনুযায়ী তিনবার নাচিকেত-অগ্নির চয়ন অর্থাৎ আরাধনা করে, সে জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করে। পরন্তু ব্রহ্ম থেকে সৃষ্ট সর্বজ্ঞ ও বন্দনীয় অগ্নিদেবকে শাস্ত্রের উপদেশ থেকে জেনে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করলে প্রত্যক্ষ দর্শনের যে নিরতিশয় শান্তি তাই লাভ করে।

যজ্ঞের ইঁটের স্বরূপ, সংখ্যা ও অগ্নিচয়ন পদ্ধতি সম্যক্‌ভাবে জেনে যে তিনবার নচিকেত-অগ্নি চয়ন করেছে ও জেনেছে যে—এই সর্বজ্ঞ বরণীয় অগ্নিই হলেন প্রাণরূপে, জ্যোতিরূপে ব্রহ্মের প্রকাশ ; এজন্য ইনি লোকাদি জগতের প্রতিষ্ঠা। এঁকে যে নিজ আত্মারূপে বুদ্ধিতে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, সে এই জীবনেই মৃত্যুর সবরকম বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুর বন্ধনরূপ অধর্ম, অজ্ঞান, রাগ, দ্বেষ, বাসনা-কামনার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়। মুক্ত হয় সংসারের সবরকম দুঃখ ও শোক থেকেও। এমনকি অগ্নিকে নিজের মধ্যে অনুভব করে বিমল আনন্দ উপভোগ করে। নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বর যা চেয়েছিলে সেই স্বর্গলোক পাওয়ার উপায় অগ্নিবিদ্যা আমি তোমাকে দান করলাম। জনগণ এই অগ্নিকে তোমারই নামে অভিহিত করবে। এখন তুমি তোমার তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

যমরাজের কথা শুনে নচিকেতা বললেন—কেউ কেউ বলে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে। কেউ কেউ বলে থাকে না। পরলোক সম্বন্ধে মানুষের মনে এই যে তত্ত্ব এ-বিষয়ে আমি আপনার কাছে বুঝিয়ে বলার জন্য প্রার্থনা করছি। এটিই আমার আকাঙ্ক্ষিত তৃতীয় বর।

যম বললেন—নচিকেতা, তুমি যে বর চাইছ, সে-বিষয়ে দেবতারাও আগে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আত্মার তত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সাধারণ লোক এ-তত্ত্ব সহজে বুঝতে পারে না। সেজন্য তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। তুমি এই বর পাওয়ার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করো না। আমার কাছে তুমি এই প্রার্থনা ত্যাগ করো। তখন নচিকেতা বলেন—হে যম, আপনি বললেন—আত্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় এবং দেবতারাও এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ নন। সেজন্য আমি তা জানতে চাই। আত্মতত্ত্ব যদি এত সহজেই বোঝা যেত এবং সে-বিষয়ে কারও সন্দেহ না থাকত, তবে আমি আপনার কাছে এ বরও চাইতাম না। পরন্তু, আপনি পরলোকের অধীশ্বর। আত্মার তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার মত পণ্ডিত ও উপদেষ্টাও আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সেজন্যই আপনার কাছে

এসে আমি আত্মতত্ত্ব জানার যে সুযোগ পেয়েছি তা ত্যাগ করা উচিত নয় বলে মনে করি। তাছাড়া আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক বরের তুল্য অন্য কোন বরই হতে পারে না। কারণ, সকল বরের ফলই অনিত্য। একমাত্র আত্মজ্ঞানের দ্বারাই পরম পুরুষার্থ পাওয়া সম্ভব। সুতরাং এই বরই আমার প্রার্থনা।

যম দেখলেন—আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত কঠিন জেনেও নচিকেতা সেই বরই চাইছেন। সেজন্য তাঁকে সে বর চাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে তিনি নানারকম লোভ দেখাতে শুরু করে বললেন—তুমি শতবর্ষ-জীবী পুত্র, পৌত্র, বহু গবাদি পশু, হাতী, ঘোড়া এবং বহু পরিমাণে সোনা নাও। বিরাট রাজ্য অথবা সাম্রাজ্য কিম্বা যত বৎসর খুশি আয়ু চাও— সবই আমি তোমাকে দিচ্ছি। বা তোমাকে আমি যে বর দিতে চাইলাম তুমি যদি তার তুল্য অন্য কোন বরও চাও যেমন—প্রচুর ধন-সম্পত্তি এবং বংশানুক্রমে জীবিকা-নির্বাহের উপায় অথবা চিরজীবন—তবে তাই প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত কাম্য বস্তুর ভোক্তা করে দিচ্ছি। পরন্তু এই পৃথিবীতে যে সব কাম্য পদার্থ অতি দুর্লভ সে সমস্তও তুমি ইচ্ছামত প্রার্থনা কর। ওই যে রথোপরি বাদ্যযন্ত্র হাতে রমণী সকলকে দেখছ—মানুষ যাদেরকে পেতে পারে না—ওইগুলিও তোমাকে দিচ্ছি। ওরা তোমার পরিচর্যা করবে। কিন্তু নচিকেতা তুমি মৃত্যু বিষয়ে প্রশ্ন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করো না।

নচিকেতা বললেন—হে যমরাজ, আপনি যে-সব ভোগ্য বস্তু আমাকে দিতে চান—এসবই ক্ষণস্থায়ী। আজ আছে কাল থাকবে কি-না সন্দেহ। এরা মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্ষয় করে। আর আপনি দীর্ঘ জীবন আমাকে দিতে চান, অনন্তকালের তুলনায় তাও নিতান্তই অল্প। অতএব এই রথ, অশ্ব প্রভৃতি বাহন, নৃত্যগীত, সুন্দরী অপ্সরা এসবই আপনার থাকুক, আমি এগুলি কিছুই চাই না। চিত্ত বা ধনের দ্বারা মানুষের তৃপ্তিলাভ হতে পারে না। বিশেষতঃ আপনার

দর্শন যখন পেয়েছি তখন ধনলাভ নিশ্চয় করব। আর যতদিন আপনি যম রাজ্যের রাজা থাকবেন ততদিন আমরা নিশ্চয় বেঁচে থাকব। তার জন্য কোন বর প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। কাজেই আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক বরই আমি প্রার্থনা করি। তিনি আরও বলেন, হে যমরাজ, আমি জানি যে, এই পৃথিবীবাসী জরামরণশীল মানুষ—রোগ-শোক-দুঃখের অধীন। বার বার জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাকে বহু কষ্ট ভোগ করতে হবে। আমি আরও জানি যে, এই সংসারের ভোগ্য বস্তু সকলই অনিত্য। এ সকল অনিত্য বস্তু আমাকে জরা-মরণ-দুঃখ থেকে ত্রাণ করতে পারবে না। ভাগ্যক্রমে আপনার মত জরা-মরণহীন দেবতার আমি অনুগ্রহ পেয়েছি। সুতরাং আপনার কাছে শ্রেষ্ঠ বস্তু পাওয়া যেতে পারে এমন কথা জানার পরও কি আমার পক্ষে কোন অনিত্য ভোগ্য পদার্থ প্রার্থনা করা সম্ভব? আপনি যখন বর দিতেই চেয়েছেন তখন আমার এমন বর প্রার্থনা করা উচিত যার দ্বারা জরা-মরণ প্রভৃতি দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। যে-সব লোক অজ্ঞ, যারা সংসারের সার পদার্থ জানে না, তারাই এ সকল ভোগ্য বস্তু কামনা করে। আমি যখন এসকল বস্তুর অনিত্যতা ও অসারতা সম্বন্ধে অনুভব করেছি, তখন আপনার প্রস্তাবিত ভোগ্যবস্তু- সকল আমি কিছুতেই গ্রহণ করব না। কাজেই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানই আমাকে বলুন। আমি সেই বরই প্রার্থনা করি।

যমরাজ এতক্ষণ ধরে নচিকেতাকে পরীক্ষা করছিলেন যে, তাঁর আধারটি কী রকম? যখন তিনি বুঝলেন—আধার বড়ই উত্তম, তখন তিনি তাঁকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান দিতে শুরু করে বলতে থাকলেন—আমাদের ইন্দ্রিয়ের পক্ষে যেগুলি সুখকর যেমন—রূপ, রসাদি, যা হৃদয়ের প্রীতিকর যেমন স্ত্রী-পুত্রাদি, যা পরলোকে বাঞ্ছনীয় যেমন স্বর্গ—এগুলি আমাদের প্রেয় বস্তু। এমনকি ধর্ম, অর্থ, কাম—এই তিন পুরুষার্থকেও প্রেয় বলা হয়।

আর সংসারের ভোগ্য পদার্থে আসক্ত না হয়ে আত্মার জ্ঞান লাভের

দ্বারা পরম ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংসারের জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করাই শ্রেয়। এটিই মোক্ষ। মানুষ হয় শ্রেয়, না হয় প্রেয় এর যেকোন একটি বস্তুকে পাওয়ার জন্যই এ সংসারে বাস করে। এজন্যই প্রত্যেক মানুষকে শ্রেয় বা প্রেয় দ্বারা আবদ্ধ বলা হয়। যারা প্রেয়কে ধরে থাকেন—তাদের মঙ্গল, তারা ভগবানকে পেয়ে সংসারের দুঃখ শোক ও জরা-মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্যদিকে যারা প্রেয় বস্তুতে আসক্ত হয়ে সংসারে মগ্ন হয় তারা পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হয়। তারা ভগবানকে লাভ করতে পারে না। শোক, দুঃখ, জরা-মৃত্যুর অধীন হয়ে বারবার সংসারে যাতায়াত করে।

শ্রেয় ও প্রেয় পরস্পর বিভিন্ন হলেও সেগুলি উভয়েই মানুষের কাছে উপস্থিত হয়। বিবেকবান পুরুষ সবকিছু বিবেচনা করেই এই দুটিকে পৃথক করে প্রেয় থেকে শ্রেয়কে বেছে নেন। আর যারা অজ্ঞানী তারা জাগতিক যে বস্তুকে পায়নি তাকে পেতে চায় এবং যা পেয়েছে তাকেই রক্ষা করতে চেয়ে প্রেয়কে গ্রহণ করে।

কিন্তু নচিকেতা, বারবার প্রলুব্ধ হয়েও পুত্রাদি প্রিয়জন, এবং মনোহর অপ্সরা ও ধনরত্নাদি কাম্য বস্তুর অনিত্যতা ও অসারত্ব দেখে তুমি গ্রহণ করো নি। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে তুমি শ্রেয়প্রার্থী, তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করার পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি।

বিদ্যা ও অবিদ্যা বলে কথিত বিষয় দুটি সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাদের গতি এবং ফলও পৃথক্। কিন্তু নচিকেতা, তোমাকে আমি বিদ্যাপ্রার্থী বলেই মনে করি। কারণ বহু কাম্য বস্তুও তোমাকে প্রলুব্ধ বা বিচলিত করে শ্রেষ্ঠ পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারেনি। যে-সকল ব্যক্তি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থেকেও আপনাদের বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলেই অভিমান প্রকাশ করে তারা এক অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অপর অন্ধের মত নানা কুটিল পথে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, কোনওদিনই গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে পারে না। অনেক লোক আছে যারা বালকের

মত বিচারবুদ্ধিবিহীন। বালকেরা যেমন স্থূল বস্তুকে দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়ে যায়, সূক্ষ্ম বিষয়কে ধারণা করতে পারে না, পরিণামের বিষয় চিন্তাও করে না, তেমনি স্থূলবুদ্ধির লোকেরাও আপাততঃ মনোহারী ধন-জন-বিষয়ের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে যায়, পরিণাম চিন্তা তারা করে না। এরা বিবেকবুদ্ধিবর্জিত এবং পরমার্থ বিষয়ে জ্ঞানহীন ও ভ্রান্ত। এ জাতীয় লোকের কাছে পরলোকতত্ত্ব বা তার সাধন কিছুই প্রকাশ পায় না। এরা এই দৃশ্যমান জগৎ এই দেহকেই সবকিছু বলে মনে করে। এরপর যে আত্মা থাকতে পারে তা উপলব্ধি করতে পারে না। আর এ-ভাবেই এই স্থূলজগৎ সর্বস্ব দেহাত্মবাদী লোকেরা বারবার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়ে এই সংসারে বারবার যাতায়াত করে। তাদের মুক্তিও হয় না বা অমৃতস্বরূপ পরম ব্রহ্মকেও তারা লাভ করে না।

যম আরও বলছেন—আত্মতত্ত্ব জগতে অপ্রকাশিত ; কারণ, বহু লোকের মনে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানার কোন আগ্রহই নেই। যদি বা কারও মনে সে আকাঙক্ষা জাগে কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞানী উপযুক্ত বক্তার বা আচার্যের অভাব। আবার যদি-বা কেউ তাও পায় কিন্তু আত্মার কথা শুনেও জ্ঞান লাভ করতে পারে না। কেন-না, আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে যে বিচারবুদ্ধি ও চিত্তের নির্মলতা দরকার তা-তো তাদের নেই। তাছাড়া আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি বক্তা হবেন তাঁকে অবশ্যই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। যাঁর আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়নি তিনি আত্মজ্ঞান দিতে পারেন না। আত্মজ্ঞানের বক্তা অপরোক্ষ জ্ঞান বিশিষ্ট না হলে শ্রোতার পক্ষে আত্মাকে বুঝা কঠিন হবে এ কারণেই যে—আত্মা সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর, সুতরাং তিনি তর্কাতীত। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়ে বাহ্য জগতের যে জ্ঞানলাভ করি বা মন দিয়ে যা চিন্তা করি আমাদের যুক্তি তর্ক তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-মন দিয়ে স্থূল বিষয়েই জ্ঞানলাভ করতে পারি এবং এই সকল স্থূল বস্তুই আমাদের তর্কের বিষয় হয়ে থাকে। কাজেই অতি সূক্ষ্ম যে আত্মা, যাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝা যায় না, জানা

যায় না তাকে কি তর্ক দ্বারা পাওয়া যায়? হে নচিকেতা, তোমার মধ্যে যে সৎ বুদ্ধি আছে তাঁকে তর্ক দিয়ে পাওয়া যায় না। তর্কবিমুখ, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন আচার্যের উপদেশ পেলেই এরকম সদ্ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই আত্মার বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করতে পারে। নচিকেতা, তোমার মত জিজ্ঞাসু শিষ্যই আমরা চাই। আমি জানি ধনরত্ন ও যজ্ঞোপকরণাদি সমস্তই অনিত্য পদার্থ। আমরা যজ্ঞাদিরূপ যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করি, তারও ফল অনিত্য। এগুলির মধ্য দিয়ে ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগ হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা পরমব্রহ্মপদ লাভ করা যায় না। একথা জেনেও আমি অনিত্য দ্রব্য দিয়ে নচিকেত অগ্নির চয়ন করেছি এবং তারই ফলরূপে এই আপেক্ষিক নিত্য যে যমের পদ তা পেয়েছি, কিন্তু পরমব্রহ্ম পদ পেয়ে মুক্তিলাভ করতে পারিনি। নচিকেতা, তুমি তোমার ধৈর্যের গুণে ও সুন্দর বুদ্ধির দ্বারা সকল কামনার সমাপ্তি ঘটিয়ে, সমস্ত জগতের আশ্রয়, যজ্ঞের অনন্ত ফল, সবরকম ভয়ের নিবৃত্তি, স্তুতিযোগ্য অণিমাদি ঐশ্বর্যযুক্ত, বিস্তীর্ণগতি এবং সর্বলোক জয়রূপ প্রতিষ্ঠার হেতু—এসকল বিচার করে সেগুলিকে পরিত্যাগ করেছ।

আত্মাকে সহজেই দেখা যায় না। অনেক কষ্ট, অনেক পরিশ্রম এবং অনেক সাধনার পব তাঁর দেখা পাওয়া যায়। আমরা চোখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে ষেভাবে বাহ্য বস্তুকে দেখতে পাই সেভাবে আত্মাকে দেখতে পাওয়া যায় না। সাধনায় বুদ্ধি নির্মল হলে সেই নির্মল বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে জানা যায়। আত্মা যে সহজে দর্শনযোগ্য নন, তার কারণ তিনি অতি গূঢ়ভাবে জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, তিনি বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত। ইন্দ্রিয়ের অতীত দুর্গম স্থানে অবস্থিত। সনাতন, প্রকাশময় আত্মাকে অধ্যাত্মযোগের অনুশীলনের মধ্য দিয়েই পাওয়া যেতে পারে। বিষয় থেকে চিত্তকে ফিরিয়ে এনে আত্মাকে স্থাপন করার নাম অধ্যাত্মযোগ। এই অধ্যাত্মযোগ আয়ত্ত হলেই আত্মাকে লাভ করা যায়, তাঁকে দেখা যায়। যে এভাবে যোগের সাহায্যে আত্মাকে

পায়, সে সুখ-দুঃখের অতীত হয়। অনাত্ম বিষয়ে অজ্ঞানী লোকের চিত্তেই সুখ বা দুঃখের চঞ্চলতা আসে। যে আত্মাকে লাভ করে সে সুখেও উল্লসিত হয় না, দুঃখেও ভেঙ্গে পড়ে না। সব সময় সে হয় শান্ত, নির্বিকার ও অচঞ্চল। নচিকেতা, যে আত্মতত্ত্বের কথা তোমাকে বলছি আচার্যের কাছে তা শুনে এবং আত্মসংস্থ (নিজ সদৃশ) ধর্ম হতে অনপেত (অবিচ্যুত) সূক্ষ্ম আত্মাকে যিনি লাভ করেন, তিনি সেই আনন্দময় পুরুষকে লাভ করে স্বয়ং আনন্দ অনুভব করেন। এই ব্রহ্মভবন নচিকেতার কাছে এখন উন্মুক্ত হয়ে গেছে, নচিকেতা এখন মোক্ষলাভের যোগ্য হয়েছেন বলেই আমার মনে হয়।

নচিকেতা এর আগে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি-না তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এখন আত্মার স্বরূপ বিষয়ে প্রশ্ন করে বললেন—হে যমরাজ ধর্মের অতীত, অধর্মের অতীত, এই দৃশ্যমান কার্যকারণের অতীত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানরূপ কাল বিভাগের অতীত যা আপনি প্রত্যক্ষভাবে দেখছেন তা আমাকে বলুন।

নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যমরাজ প্রথমেই পরমাত্মার প্রতীক ওঁ-কারের ব্যাখ্যা করে বলতে থাকেন—বেদে সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্ প্রভৃতি শব্দ দিয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্তন করা হয়েছে। ওঁ-কার অতি সংক্ষেপে এসকল স্বরূপবাচক শব্দের অর্থ প্রকাশ করে। সেজন্যই ওঁ-কার শব্দটি ব্রহ্মস্বরূপের অর্থ প্রকাশক। ওঁ-কার ব্রহ্মের বিষয়ে আমাদের জানায় বলে তাকে 'শব্দব্রহ্ম' বলা হয়। যারা সংযমী তাঁরা এই ওঁ-কার-বাচ্যতত্ত্ব লাভের জন্যই গুরুগৃহে বাস, বীর্যধারণ প্রভৃতি কঠোর তপস্যা করেন। ওঁ-কার—এই অক্ষরই সর্বগত ব্রহ্ম, এই অক্ষরই সর্বাতীত ব্রহ্ম। ওঁ-কার ব্রহ্মের এই দুরকম ভাবেরই জ্ঞাপক। ব্রহ্ম একমাত্র সত্য। পর ও অপর, সর্বাতীত এবং সর্বগত—এঁর দুটি ভাব মাত্র। যিনি সর্বগত, তিনিই সর্বাতীত। ওঁ-কার ব্রহ্ম এই উভয় ভাবেরই জ্ঞাপক বলেই ওঁ-কার তত্ত্ব জানা হলেই সম্যক্ ব্রহ্মকে জানা হয়। যিনি এভাবে ওঁ-কারকে ব্রহ্মরূপে জেনে উপাসনা করেন, তাঁর অপ্রাপ্য

কিছু থাকে না। ব্রহ্মকে লাভ করার জন্য যত উপায় আছে তার মধ্যে ওঁ-কার শ্রেষ্ঠ, এটি ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক। একে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় ওঁ ব্রহ্মের জ্ঞাপক বলে জানলে সাধক ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হন।

ওঁ-কার প্রসঙ্গে বলার পরই যমরাজ আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে বলছেন—এই আত্মা জন্মেও না, মরেও না, কোন কিছু থেকে হয়নি, কোন কিছুও এর থেকে হয়নি। এই আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় ও পুরাণ অর্থাৎ চিরবিদ্যমান। দেহ নিহত হয় কিন্তু আত্মা হত হয় না। হত্যাকারী যদি ভাবে সে অর্থাৎ তার আত্মা অপর আত্মাকে হত্যা করছে, আর নিহত ব্যক্তি যদি ভাবে তাহার আত্মা হত হল—তবে তা উভয়ই ভুল। কারণ আত্মা হননও করে না, হতও হয় না। জীব অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে দেহে আত্মাভিমান করে। সে মনে করে—এই দেহই আমি। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ বলেই দেহের কাজ, প্রকৃতির কাজকেই সে আত্মার কাজ বলে মনে করে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে আত্মা অনাসক্ত, নির্লিপ্ত এবং কর্তৃত্বাভিমানশূন্য।

যে আত্মা এই জগতে প্রকাশমান তাই জীবের হৃদয়ে জীবাত্মারূপে দেহ-মন-প্রাণের ক্রিয়ায় আবৃত হয়ে গুহাতে অবস্থিত বস্তুর মত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছেন। আত্মা জীবের বুদ্ধি দ্বারাতেই লভ্য, এই বুদ্ধির স্থান হৃদয়। যোগিগণ এই হৃদয় আকাশে আত্মাকে জ্যোতিরূপে দর্শন করেন বলেই হৃদয়কে আত্মার বাসস্থান বলা হয়।

আত্মা অতি সূক্ষ্ম এবং গোপনভাবে অবস্থিত থাকার জন্যই সাধারণ লোক তাঁকে জানতে পারে না। কেবল কামনা-বাসনা ও শোক-দুঃখহীন ব্যক্তিই আত্মাকে দেখতে পান। যার চিত্তে কামনা নেই তার দুঃখও জন্মে না। কামনা, বাসনা ও শোক-দুঃখের সৃষ্টি হল চিত্তের মলিনতার কারণে। চিত্তের এই মলিনতা দূর হলে জীবের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রসন্ন এবং নির্মল হয়। বুদ্ধি নির্মল হলে সেই নির্মল বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়। সাধক তখন আত্মার মহিমা উপলব্ধি করেন।

তিনি বুঝতে পারেন আত্মাই স্বরূপতঃ পরমাত্মা। তিনি আর পরিচ্ছিন্ন শোক-দুঃখময় জীব নন, তিনি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। এরকম জ্ঞান হলে শোক-দুঃখের অস্তিত্ব আর থাকে না, সাধক আনন্দস্বরূপকে পেয়ে নিজেও আনন্দময় হয়ে ওঠেন। ....ইত্যাদি আত্মজ্ঞানের বিষয়ে বহু গভীর উপদেশ দান করে নচিকেতার আত্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করেন।

উপনিষদের দিব্য আলো যাঁর শুদ্ধ জীবনটিতে স্বতই উদ্ভাসিত, সেই প্রণবানন্দজী জগদ্বাসীকে আত্মজ্ঞান লাভের পথে প্রবর্তিত করতে চেয়ে তার মহাবাণীর প্রথম বাণীতেই বলছেন—লক্ষ্য কি? —মহামুক্তি, আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি। কিন্তু এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি তো আর হাতের মোয়া নয়—যে কামনা বাসনায় জর্জরিত, রিপু ও ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়নে উৎপীড়িত সাধারণ লোকও সহজেই পেয়ে যাবে। সে জিনিস পেতে হলে হতে হবে—নির্মল বুদ্ধি ও শুদ্ধ জীবনের অধিকারী। হতে হবে ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, হতে হবে উদার, বিবেকবান, হতে হবে কামনা-বাসনা শূন্য। তাই তিনি জগতের মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন—

“ধর্মের প্রাণ—অনুভূতি, অনুষ্ঠান ও আচরণে। শাস্ত্র পড়িয়া, লোকমুখে শাস্ত্রকথা শুনিয়া কেহ কখনও ধর্মলাভ করিতে পারে না। যে মন ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, রিপুর উত্তেজনায় বিশেষ উৎপীড়িত, কামনা-বাসনার জ্বালায় নিয়ত জর্জরিত, সেই মন, সেই বুদ্ধি লইয়া যদি কেহ ধর্মতত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে যায় তবে তাহাকে বাতুল বৈ আর কি বলা যাইতে পারে?”

দ-দ-দ

দেবতা, মানুষ আর অসুর এই তিনজনেরই পিতা হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। তিনজনই ব্রহ্মচর্যব্রত নিয়ে পিতার আশ্রমে আছেন। এরপর যখন তাঁদের তপস্যার কাল শেষ হয়ে গেল তখন দেবতারা একদিন পিতা প্রজাপতিকে বললেন—এবার আপনি আমাদের উপদেশ দিন। দেবতাদের উপদেশ দিতে গিয়ে প্রজাপতির হয়তো মনে হয়েছে—সত্ত্বগুণযুক্ত দেবতারা আত্মবলে সবার চেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠ। তাঁদের এমনই শক্তি যে, ইচ্ছামাত্র এই জগতের সকল ঐশ্বর্য সহজভাবেই তাঁরা ভোগ করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে যদি দেবতারা ইন্দ্রিয়সুখ সম্ভোগের জন্য সেদিকেই ধাবিত হন, তাহলে তাঁরা যে শক্তি অর্জন করেছেন তার অপপ্রয়োগ করা হবে। ফলে দেবতারাই শুধুমাত্র হবেন ভোগবিলাসের অধিকারী আর অন্যেরা হবে বঞ্চিত। তাতে সৃষ্টির ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই ভোগের আকাঙ্ক্ষা যেন দেবতাদের সর্বগ্রাসী করে তুলতে না পারে তার জন্য চাই ইন্দ্রিয়-সংযম বা আত্মসংযমের উপদেশ। এরকম গভীর ভাবনা ভেবে প্রজাপতি তাঁদের কাছে মাত্র একটি অক্ষর উচ্চারণ করলেন—'দ'। দেবতারাও শুনলেন—'দ'। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা বুঝলে তো? কি বুঝলে? দেবতারা বললেন—বুঝলাম, আপনি আমাদের এই উপদেশই দিলেন —তোমরা দান্ত হও। অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মসংযম করার উপদেশই আপনি দিলেন। শুনে প্রজাপতি খুবই খুশি হলেন। বললেন—হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই বুঝেছ।

তারপর মানুষেরা পিতা প্রজাপতির কাছে এসে বললেন—প্রভু, এরপর আপনি আমাদের উপদেশ দিন। প্রজাপতি তাঁদের দেখেই সম্ভবত যা ভাবলেন বলে মনে হয়—বিত্ত-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ সুজলা-সুফলা পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যায় লোভী, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। লালসায় মুগ্ধ হয়ে নিজেদের ভোগসুখের

জন্য ও ধন-সম্পদ বাড়ানোর জন্যই বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত হয়ে থাকবে।
অন্য লোকের দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগও তারা নেবে না। মানুষ অন্যকে বঞ্চিত করবে। কারণ এটাই তাদের স্বভাব। এই স্বভাব নিয়েই তারা এই পৃথিবীতে জন্মেছে। সুতরাং সেই ভাব যদি বলবান হয়, তাহলে ত্যাগ করে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে না আসাই স্বাভাবিক। যার ফলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হবে। বিশ্বসৃষ্টিতে দেখা দেবে বৈষম্যের কলহ। তাই মানুষকে শেখানো দরকার—দান কর। আগে ত্যাগ করে, তারপর ভোগ কর। যতটুকু প্রয়োজন সেটুকুই নাও। প্রয়োজনের বেশি সঞ্চয় করা অনুচিত। অন্যের বিপদে তার পাশে দাঁড়াও। তাকে সাহায্য কর। প্রকারান্তরে মানুষের নিজের হৃদয়কে প্রসারিত করা ও সামগ্রিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। এ সকল ভাবনা ভেবেই প্রজাপতি তাঁদেরও বললেন—'দ'। মানুষেরা প্রজাপতির মুখ থেকে শুনলেন 'দ'। প্রজাপতি তাদের কাছে জানতে চাইলেন—তোমরা বুঝলে তো? মানুষেরা বললেন—হ্যাঁ, আমরা বুঝলাম ; আপনি আমাদের বলছেন—তোমরা দান কর। শুনে প্রজাপতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই বুঝেছ।

এরপর সবার শেষে এলেন অসুরেরা। তাঁরাও এসে বললেন, হে প্রভু, এবার আপনি আমাদের উপদেশ দিন। প্রজাপতির অসুরদের দেখে হয়তো যা মনে হয়েছিল—অসুরেরা স্বভাবতঃ দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন আর শারীরিক শক্তির উন্মত্ততাতেই সব সময় ব্যস্ত। অন্যের উপর অকারণে অত্যাচার ও নির্যাতন করে শান্তি নষ্ট করাই তাদের অন্তরের সহজাত প্রবৃত্তি হতে পারে। আর সেই স্বভাব নিয়েই যদি তারা চলে তাহলে সমাজ-সংসারের সুস্থিতি বিনষ্ট হবে। অপপ্রয়োগ হবে শক্তিরও। সুতরাং অসুরদের শক্তির উচ্ছৃঙ্খলতাকে বেঁধে রাখতেই হয়তো প্রজাপতি তাঁদেরও উপদেশ দিলেন সেই একই অক্ষর—'দ'। যার অর্থ দয়া কর। অসুরেরা শুনলেন—'দ'। ক্ষণকাল পরই

প্রজাপতি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কি বুঝলে? অসুরেরা বলেন—আমরা বুঝলাম, আপনি আমাদের বলতে চাইছেন—দয়া কর। প্রজাপতি তাদের উত্তরে শুনে প্রসন্ন হয়ে এবারও বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই বুঝেছ তোমরা.

আজও যখন আকাশে মেঘের গর্জন হয়, তখন জগৎপিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার সেই অনুশাসনই যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়—'দ'—'দ'—'দ'। অর্থাৎ দান্ত হও, দান কর ও দয়া কর। এই তিনটিই সারা জগতের মানুষের কাছে শিক্ষার বিষয়। অনুসরণ করার বিষয়।

সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীও যেন এ যুগে আবির্ভূত হয়ে পুনরায় উপনিষদের সেই 'দ'-'দ'-'দ'র প্রতিধ্বনিই করে গেলেন তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে। তিনি বলেছেন—**ভুলিয়া যাও রিপুর উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন, বিস্মৃত হও—পাপ-তাপ-আধিব্যাধি ; ধর সূতীক্ষ্ণ বিবেক-বৈরাগ্যের অসি ; ছিন্ন করিয়া ফেল যাবতীয় মায়া-মোহ-ভ্রম-ভ্রান্তির কুসংস্কার জাল। এইরূপে নিত্যশুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হইয়া পরিত্রাণ কর পতিতকে, রক্ষা কর বিপন্নকে আশ্রয় দাও, নিরাশ্রয়কে, শান্তি-সুখ দাও সন্তপ্তকে।**

বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে

যাজ্ঞবল্ক্য—মৈত্রেয়ী সংবাদ

বেদের যুগে ভারতবর্ষের মানুষেরা পুরো জীবনকে চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। যেমন ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এগুলির প্রত্যেকটিকেই এক-একটি আশ্রম বলা হত। বালক বয়স থেকে লেখাপড়া শুরু হত। এসময় থাকতে হতো গুরুর আশ্রমে। সেখানে থেকে লেখাপড়া করতে হত। লেখাপড়া শেষ হলে ওই বালক আবার বাড়িতে ফিরে আসত। তখন অবশ্য সে হয়ে যেত একজন যুবক। এই যে বালকবয়সে গুরুর আশ্রমে যাওয়া এবং সেখান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত যে সময়—এই সময়কে বলা হত ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য পালনের উপর সে যুগে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হত। কারণ ব্রহ্মচর্য ঠিক ঠিক পালন না হলে যেমন মানুষের শরীরের সুন্দর গঠন সম্ভব হয় না, তেমনি মনেরও গঠন হয় না। আর ঠিক মত ব্রহ্মচর্য পালন না হলে ব্রহ্মবিদ্যা বা চরম বিদ্যা লাভ করা মোটেই সহজ কাজ নয়।

যাহোক, বিদ্যার্থী গুরুগৃহে থেকে পড়াশুনা শেষ করে বাড়িতে ফিরে এলে তার বিয়ে দেওয়া হত। বিয়ের পর সৎভাবে রোজগার করার সঙ্গে সঙ্গে সংসার করতে হত শাস্ত্র অনুযায়ী। সে জীবনেও স্বামী-স্ত্রীকে করতে হত যথেষ্ট সংযমী জীবন যাপন। সংসার-জীবন পার হওয়ার পর তাঁরা বানপ্রস্থ নিতেন। অর্থাৎ এই বয়সে সংসারের মূল দায়-দায়িত্ব ছেলে-মেয়েদের হাতে দিয়ে নিজেকে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করা। তার পরের আশ্রম ছিল—সন্ন্যাস। অর্থাৎ, সে সময় পুরোপুরি ঈশ্বরচিন্তায়, ঈশ্বর ধ্যানে ডুবে থাকার সুযোগ। সেকালে এভাবেই সংসার-জীবনগুলি চলত বলে বহু মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত লাভ করতে পারতেন।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও ছিলেন সে যুগের একজন সেরকমই আদর্শ গৃহী। তাঁর ছিলেন দুই স্ত্রী। একজনের নাম মৈত্রেয়ী, অন্যজনের নাম ছিল কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ী ভাল চরিত্রের মানুষ ছিলেন। সংসারের কাজকর্ম

যথারীতি করতেন। কিন্তু সর্বদা মনটি পড়ে থাকত আত্মচিন্তায়। ঠিক যাজ্ঞবল্ক্যেরই মত। আর কাত্যায়নী ? তিনিও যেমন সৎ মানুষ ছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর পতিভক্তিও। কিন্তু সাংসারিক কাজ তাঁর খুবই ভাল লাগত, সে কাজের মধ্যেই তিনি বেশি ডুবে থাকতেন। ওই আত্মচিন্তার বিষয়ে ততটা মাথা ঘামাতেন না। দুই জনের দুই রকম চরিত্র অবশ্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের অজানা নয়। তিনি সবই জানতেন।

যা হোক ঋষির বয়স তখন প্রৌঢ়ত্বে এসে গেছে। তাই তিনি ঠিক করলেন আর সংসারে না থেকে এখন গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন। সেজন্য স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডেকে বললেন—আমি এবার সংসার ছেড়ে চলে যাব বলে ভেবেছি। কিন্তু যাওয়ার আগে আমার যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে সবকিছু তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়ে যেতে চাই, যাতে এই বৈষয়িক কারণে তোমাদের মধ্যে আর কোনওভাবেই কোন দিন মনোমালিন্য হতে না পারে।

স্বামীগতপ্রাণ মৈত্রেয়ীর। ঋষি-স্বামী সংসার ছেড়ে বনে চলে যাবেন। এ-কি তাঁর প্রাণে সয়? স্বামী বনে গিয়ে আত্মচিন্তায় গভীর ধ্যানে ডুবে থাকবেন—আর তিনি কি-না এই বিষয়চিন্তায় হাবুডুবু খাবেন? তাই-বা হয় কি করে? তাছাড়া এই বিষয় দিয়েই বা তাঁর কি হবে? তিনি তো কখনও বিষয়কে আঁকড়ে ধরেননি। বরং স্বামীর মত আত্মচিন্তাকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করেছেন। সুতরাং আজ ব্রহ্মজ্ঞ স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে তিনি বিষয়কে জড়িয়ে থাকবেন কেন?

এ সমস্ত কথা ভেবে বুদ্ধিমতী মৈত্রেয়ী স্বামীর কাছে সবিনয়ে বললেন—"প্রভু, এই ধনসম্পদ কি আমাকে পরমানন্দ দিতে পারবে? এই সারা পৃথিবীটাও যদি বিত্ত-সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে একেবারে আমার নিজস্ব হয় তাহলেও কি অমৃতত্ব পাব?"

মৈত্রেয়ীর কথা শুনে ঋষি বিস্মিত হলেন না। কারণ তিনি তো আগে থেকেই মৈত্রেয়ীর মনের খবর জানতেন। তাই বরং আনন্দিতই

হলেন—এই তো যথার্থ সহধর্মিণী ; যোগ্য পত্নীর যোগ্য জিজ্ঞাসা। তাই ঋষি মনে কোনরকম সঙ্কোচ না রেখে, সামান্য নারীর সাধারণ প্রশ্ন বলে হেয় জ্ঞান না করে নিঃসঙ্কোচে, বিনা দ্বিধায় বললেন— না মৈত্রেয়ী, তুমি যে অমৃতত্বের, যে পরমানন্দ-স্বরূপের আশা করছ এ-থেকে তো তোমার সে আশা কখনোই পূর্ণ হতে পারে না। ধন-সম্পদে সমৃদ্ধশালী লোকের জীবন যেভাবে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই কাটে তোমারও জীবন সেভাবেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটবে। ধন-ঐশ্বর্য মানুষকে সুখ দিতে পারে, কিন্তু অমৃত বা পরমানন্দের দিব্য প্রশান্তি কখনোই দিতে পারে না।

স্বামীর মুখে এমন জ্ঞানের কথা শুনে মৈত্রেয়ী সবিনয়ে স্বামীর ধন-সম্পদ সব প্রত্যাখ্যান করে বললেন—"হে প্রভু, যা দিয়ে আমি অমৃত লাভ করতে পারব না, তা দিয়ে আমার কি কাজ? আপনার ওই ধন-সম্পদে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে সেই উপদেশ দান করুন, সেই ধনে ধনশালিনী করুন, যা দিয়ে আমি অমৃতের সন্ধান পেয়ে পরম আনন্দ লাভ করতে পারব।"

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বললেন—আগেও তুমি আমার আদরণীয়া ছিলে, এখনও তুমি আমার আদরণীয়াই। সুযোগ্যা সহধর্মিণীর মতই তুমি বরাবরই আমার অভিপ্রেত কাজ করে এসেছ। আমার মানসিকতা, আমার হৃদয়-বুদ্ধিকে কোনদিনই কোন অনভিপ্রেত কাজে বা কথায় তুমি ক্ষুণ্ণ হতে দাওনি। সেই প্রিয় তত্ত্বকথাই তোমার কাছে এখন ব্যাখ্যা করে যতদূর সম্ভব সহজ সরল করে বলছি। তুমি মনোযোগ সহকারে শোন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলতে থাকলেন—মৈত্রেয়ী প্রথমে শোন—স্বামী-স্ত্রী, মা ও সন্তান থেকে শুরু করে মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে ধন-সম্পদের ভালবাসার সম্পর্ক, প্রীতির সম্পর্কে বাঁধা। সেরকম কেন? এই ভালবাসা বা প্রীতির মধ্যে এমন কি রহস্য আছে যে,

কেউই এই গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারে না? আগে সেই রহস্যই তোমাকে ভালভাবে বুঝতে হবে।

তিনি বললেন—হে প্রিয়ে, পতির জন্যই যে পতি প্রিয় হন তা নয়, আত্মপ্রয়োজনেই পতি প্রিয় হন। পত্নীর জন্যই যে পত্নী প্রিয় হন তা নয়, আত্মপ্রয়োজনেই পত্নী প্রিয় হন। পুত্রদের জন্যই যে পুত্রগণ প্রিয় হয় তা নয়, আত্মপ্রয়োজনেই পুত্রগণ প্রিয় হয়। সম্পদের জন্যই যে সম্পদ প্রিয় হয় তা নয়, আত্মপ্রয়োজনেই সম্পদ প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণের জন্যই ব্রাহ্মণ প্রিয় নন, আত্মপ্রয়োজনেই ব্রাহ্মণ প্রিয় হন। ক্ষত্রিয়ের জন্য ক্ষত্রিয় প্রিয় হন তা নয়, আত্মপ্রয়োজনেই ক্ষত্রিয় প্রিয় হন। এরকম লোকসকল, দেবগণ, ভূতসকল এমনকি সবকিছুর বেলাতেই সেই একই কথা। তাঁরা সকলেই আত্মপ্রয়োজনের জন্যই নিজের প্রিয় হন।

মৈত্রেয়ী, সর্বত্রই এই একই আত্মাই বিরাজিত। সকলকে ব্যাপ্ত করে রয়েছেন একমাত্র তিনিই। সেই আত্মাকেই তোমাকে দর্শন করতে হবে, তাঁকে শ্রবণ করতে হবে, তাঁকে মনন করতে হবে, তাঁকে ধ্যান করতে হবে। এই যে আত্মা তাঁর শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ঠিকমত প্রত্যয়ের সঙ্গে করতে পারলেই তার সব কিছু জানা হয়ে যাবে। তখন তার মধ্যে আত্মজ্ঞান জেগে উঠবে। আর আত্মজ্ঞান যার হয়, সকল কিছুর সঙ্গে যে অভিন্ন হতে পারে, তার কাছে আর অমৃতত্ব লাভ অসম্ভব নয়।

মৈত্রেয়ী, ব্রাহ্মণকে আমি যদি আত্মা মনে না করে অন্য কিছু মনে করি, তাহলে যেমন ব্রাহ্মণ আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে, তেমনি ক্ষত্রিয়, স্বর্গাদি লোক, দেবতা বা বিষয়-আশয় তাদের যদি আমি আমার আত্মা বলে মনে না করি, তাহলে তারাও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, দেবতা, বিষয়-আশয় লোকসকল এসব কিছুই আত্মা। সেই যে আত্মা তাই আমার আত্মা। আমার আত্মাই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এ সকল কিছুরই মধ্যে। যদি এভাবে না ভাবতে

পারি, বিশ্বকে যদি এরকমভাবে বুঝতে না পারি, তাহলে কোনদিনই আমাদের পক্ষে অমৃত হওয়া সম্ভব নয়। সকলের আত্মা আমারই আত্মা—আমরা অখণ্ড, আমরা ভেদহীন। তেমন ভাবনাতেই তো আমাদের একাত্মতা আসে, আসে পারস্পরিক প্রীতি।

ঋষি আরও বলতে থাকলেন—ধর একটা নুনের খণ্ড জলে পড়ে গেল। যদি বলি নুনের খন্ডটাকে তুলে আন, পারবে আনতে? পারবে না। কারণ, সেটা জলের সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেছে। জলটাও হয়ে গেছে নোনতা। ওই জলের যেখানেই চুমুক দাও সেই মিশে যাওয়া নুনেরই স্বাদ পাবে। আমাদের এই আত্মাও তেমনি অনন্ত, অপার, বিজ্ঞানময়। ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর, দেবতা, মানুষ বা যত জঙ্গম দেখছ সবই সৃষ্ট হয়েছে ওই মহান্ আত্মা থেকে। তাদের রূপ আলাদা, নাম আলাদা। যখন এদের আয়ু শেষ হয়ে মৃত্যু আসে তখন তাঁরই সঙ্গে মিশে যায়। মৈত্রেয়ি, সেই মহান্ আত্মাই হল প্রকৃত তত্ত্ব। একমাত্র তাঁকে জানলেই অমৃতত্ত্বকে জানা হবে।

মৈত্রেয়ী বলেন—মানুষের মৃত্যুর পর তার জ্ঞান থাকে না, আত্মার নাম বা রূপ এসব কিছুই থাকে না, একথা শুনে আমি যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি। আমার যেন সব উল্টো-পাল্টা হয়ে যাচ্ছে।

ঋষি বলেন—আত্মা এক। তাঁর অন্য কোন সত্তা নেই। নাম, রূপ ইত্যাদি যা কিছু মনে হচ্ছে সবই তাঁর দ্বৈতভাব। এই দ্বৈতভাব বা দুই রকম ভাব যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণই আলাদা আলাদা সত্তা, গন্ধ, দেখা, শোনা, জানা এসব চলে। আত্মজ্ঞানের অভাবেই এগুলিকে দ্বিতীয় বস্তু মনে করে ভুল হয়। কিন্তু যখন এই ভুল ভেঙ্গে যায়, তখন আর ভেদবুদ্ধি থাকে না। তখন কে কাকে দেখে? কার কথা কে শুনবে? কি ভাবেই বা শুনবে?

উপাখ্যানটির প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ীর মত নারীর কথা জানলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়—যাঁকে বিষয় অভিভূত করতে পারেনি।

পরন্তু পতির যথার্থ সহধর্মিণী রূপে তাঁর মধ্যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা কত-না প্রবল ও সে বিষয়ে তাঁর কত বেশি আগ্রহ যে-জন্য সম্যক্ ধন-ঐশ্বর্য বিষয়কে তাঁর তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে। অবশ্য এই ভারতবর্ষে শুধু মৈত্রেয়ী কেন, বহু নারীই ছিলেন যাঁরা আত্মজ্ঞান নিষ্ঠায় অতুলনীয়া, যাঁদের কাছে ভোগ-বিলাস, বিষয়-বাসনা সবই তুচ্ছ। পরন্তু আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবৎ উপলব্ধির প্রতিই বেশি আকর্ষণ অনুভব করেন। এমন-কি এই ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতায় সমাচ্ছন্নতার দিনেও এদেশে তেমন মহীয়সী নারীর অভাব হয়নি। তাই স্বামী প্রণবানন্দজী বলেছেন—

এদেশ ভগবানকে লইয়াই জীবন-জনম কাটাইতেছে ও কাটাইতে চায় ; জড়বাদকেই যে দেশ চরমবাদ বলিয়া ধরিয়াছে—এ দেশ সে দেশ নয়। এ দেশ চায় নীতি, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা। পরন্তু অমৃতত্ব লাভ করার জন্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার যে সর্বত্র ব্যাপ্তির কথা, সকলের মধ্যে ব্যাপ্তির কথা মৈত্রেয়ীকে বললেন, বললেন—সবার মধ্যেই আমার আত্মা এই অনুভূতিকে অন্তরে জাগানোর কথা—উপনিষদের এই বাণীরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় স্বামী প্রণবানন্দজীর দিব্য বাণীতে। তিনি বলেছেন—**"অসহায় রুগ্ন, ক্ষুধাতুর বিপন্ন ব্যক্তিরা কিরূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে, নিজেদের সেইরূপ অবস্থায় ফেলিয়া চিন্তা কর। তোমাদের যদি ঐ প্রকার অবস্থা হইত, তাহা হইলে তোমরা কি করিতে তাহা ভাব। এমনিভাবে অপরের দুঃখ কষ্ট, বিপদাপদ নিজেদের বলিয়া অনুভব করিতে শিখিলেই সকলের প্রতি সমবেদনা, সহানুভূতি জাগ্রত হইবে তখন আর কাহারও বিপদাপদ দেখিলে স্থির থাকিতে পারিবে না, আপনা আপনিই যাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে বিপদুদ্ধারের জন্য।** অর্থাৎ, অন্যের সঙ্গে একাত্মতার যে কথা উপনিষদ বলেছেন, তাই তিনি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে

কলিতে নামেই মুক্তি

উপনিষদে আমরা পাই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা, ব্রহ্মলাভের কথা, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের কথা। তবে উপনিষদ্ সে কথা বলে জ্ঞানের পথে অর্থাৎ জ্ঞানমার্গকে আশ্রয় করে। আমরা ঈশা থেকে শ্বেতাশ্বতর যে সকল উপনিষদের কথা জানি, তেমনি আরও বেশ কিছু উপনিষদ আছে। সেগুলিতেও ব্রহ্ম-লাভ, ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের কথা বলা হয়েছে। তবে সেগুলি হয়তো ওই সকল উপনিষদের মতো কঠোরভাবে জ্ঞানমার্গের পথে নয়, ভক্তিমার্গে বা অন্যপথে। কিন্তু উদ্দেশ্য সেই একই। কলিসন্তরণ তেমন একটি উপনিষদ, যেখানে ভক্তির মাধ্যমেই সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, ব্রহ্মের দর্শন করা যায়, ব্রহ্মের সাক্ষৎকার পাওয়া যায়। অন্য উপনিষদের উপদেশ নেতি নেতি বিচার করে সেই পরমাত্মাকে জানো। তাঁকে জেনে জন্ম-মৃত্যুর জোয়ার-ভাঁটা থেকে মুক্ত হয়ে মহামুক্তির, আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির অধিকারী হও, মর্ত্যবাসী থেকে হও স্বর্গবাসী। কিন্তু এই উপনিষদের উপদেশ হল, নেতি নেতি বিচার-বিশ্লেষণ নয়; ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে ভক্তির সঙ্গে পরমেশ্বর নারায়ণের শরণ গ্রহণ কর। আহারে-বিহারে, চলনে-গমনে, শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে, কর্মে-বিশ্রামে সব সময়ই শ্রীভগবানের শরণ নেওয়ার কথা। যে শরণ নেওয়ার কথা শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীগীতায় বলেছেন। স্বামী প্রণবানন্দজীও তাঁর শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতার সঙ্ঘের শরণই মহাকল্যাণে—সেরকম শরণ নেওয়ার কথাই বলেছেন। বলেছেন প্রতিনিয়ত নাম জপ করার কথা। এই নাম জপের প্রভাবেই সাধক মূলাধার থেকে কুলকুন্ডলিনী ষট্চক্র ভেদ করে পৌঁছে যাবে সহস্রারে। সম্যক্‌রূপে মিলন হবে জীবে ও ব্রহ্মে। তখন জ্ঞানের ভাণ্ডার যাবে খুলে। খুলে যাবে আনন্দের মহা উৎস। তাইতো স্বামী প্রণবানন্দজী বলেছেন— **খুব ধ্যানজপ কর— তবেই সব বুঝিতে পারিবে। জপধ্যান ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধ হয় না।**

চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত শুদ্ধজ্ঞান জন্মে না, শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব কখনও উদ্ভেদ হয় না।

এই কলিকালে মানুষ এমনিতেই অল্প আয়ুর অধিকারী। তাতে আবার অন্নগত প্রাণ। সেই অন্নের জোগাড়ে মানুষ স্বাভাবিক কারণেই দিশেহারা। সুতরাং যোগ-যাগ-তপস্যার সুযোগ মানুষের কৈ? তাদের শক্তিই বা এখন কতটুকু। অথচ মানুষ তো এই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাহলে সে মুক্তি পাবে কিভাবে?

তাই—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর শেষে যখন কলির আবির্ভাব হবে তখন ধর্ম তার তিন পদ হারিয়ে কোন রকমে এক পদে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হবে। সেই অবস্থায় কলিপ্রভাবিত মানুষের কুটিলতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা যখন ভয়ঙ্কর রূপ নেবে তখন জীবের মুক্তির কি উপায় হবে? এই চিন্তা করে দেবর্ষি নারদ অ-স্থির হয়ে উঠলেন। তিনি মর্ত্য থেকে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে। তাঁকে ঋষি বললেন—হে প্রভু, কলির এই ঘোরতর প্রভাব থেকে মর্ত্যের মানুষের মুক্তির উপায় কি?

প্রশ্ন শুনে প্রজাপতি নারদের প্রতি খুবই প্রসন্ন হলেন। বললেন—নারদ, তোমার প্রশ্ন খুবই উত্তম। সকল শ্রুতির রহস্য একটি অতি গোপনীয় তত্ত্ব আছে, যা জানলে, যা সাধন করলে কলির জীব সংসারে ওই অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারবে। তোমাকেই সেই তত্ত্বকথা বলছি শোন—

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ হলেন নারায়ণ। স্থাবর, জঙ্গম থেকে দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব এমনকী সব কিছুরই আদি কারণ তিনিই। কলিকালে শুধুমাত্র তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই কলির প্রভাব থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে যাবে।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু, সেই নাম কি রকম? তার উচ্চারণই বা কিভাবে করতে হবে? ব্রহ্মা বললেন—

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর নিয়েই নাম-কীর্তনে হয় তাঁর নামোচ্চরণ। এই নামই কলিজীবের যাবতীয় পাপ নাশ করে। সকল বেদে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট পথ আর নেই।

ব্রহ্মা আরও বলেন—নারদ, এই ষোলটি অক্ষরই হল তাঁর ষোলটি কলা। এই ষোলটি কলায় আবৃত বা এই ষোলটি কলা নিয়ে নারায়ণই হলেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। ইন্দ্রিয়ের জ্বালায় উৎপীড়িত, রিপুর তাড়নায় তাড়িত কলির মানুষেরা ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে তৃপ্ত করতে গিয়ে যে ঘোর অন্ধকারে ডুরে মরে, এই নাম উচ্চারণে তার সেই তিমির আবরণ দূর হয়ে যাবে। রাতের অন্ধকার দূর হলে পূর্ব আকাশে যেমন উজ্জ্বল সূর্যের আবির্ভাব হয়, তেমনি জীবের হৃদয়রূপ আকাশেও প্রকাশিত হন সেই জ্যোতির্ময় জ্ঞানসূর্য। নারদ আবার জিজ্ঞসা করেন—হে প্রভু, এই নামরূপ জপযজ্ঞের বিধান কি?

প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন—নারদ, এই নাম-জপের কোন বিধি-বিধান নেই। কোন বাহ্যবিচারও নেই। শুচি বা অশুচি, পবিত্র বা অপবিত্র, ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ, বিদ্বান বা মূর্খ, ধনী বা গরীব কোন কিছুরই ভেদাভেদও নেই। যে কেউ যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, এই নাম করলে সে তাঁরই ধাম লাভ করবে। তাঁর নিকটেই যাবে। তাঁর স্বরূপই পাবে। এমন-কি তাঁর সাযুজ্য লাভ করে সে তাঁর থেকে অভিন্ন হবে। এই ষোড়শ অক্ষর নাম যে সাড়ে তিন কোটি সংখ্যক বার জপ করবে সে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ থেকে মুক্তি পাবে। তাঁর দেহ-মন শুদ্ধ হবে। নারদ, সর্বধর্ম পরিত্যাগ-জনিত যে পাপ তাও সদ্য বিনষ্ট হবে। এই নামের উচ্চারণে মানুষের সদ্যমুক্তি ঘটবে। এই হল উপনিষদ-বেদের উপদেশ।

স্বামী প্রণবানন্দজী নিজে যেমন নাম-সঙ্কীর্তন খুব ভালোবাসতেন, তেমনি অন্যদেরও নাম সঙ্কীর্তন গাইতে উৎসাহিত করেছেন। যখন তিনি ব্রহ্মচারী বিনোদ তখন বাজিতপুরে আশ্রম-কুটিরে তাঁর সঙ্গী তরুণ ও যুবকদের নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা নাম সঙ্কীর্তন গেয়েছেন। পরবর্তীকালে সঙ্ঘের কেন্দ্রগুলিতে বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রাত্যহিক নাম-সঙ্কীর্তনের প্রবর্তন তাঁরই ইচ্ছায়। তিনি জগদ্বাসীর কল্যাণে **"ওঁ হর গুরু শঙ্কর শিব শম্ভো"** তারকব্রহ্ম শ্রীশ্রীশিবনাম প্রচার করেছেন।

এই নাম-কীর্তন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—**"নাম-কীর্তনে অতি সহজে মন ভগবদ্‌ভাবে নিমগ্ন হয়। ইহা ছাড়া মনুষ্য, পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেরই কীর্তনশ্রবণে মহাকল্যাণ হয়। ধ্যানজপে শুধু নিজের উপকার হয়।"**

কলিসন্তরণ উপনিষদ থেকে

ইন্দ্রের আত্মজ্ঞান লাভ

প্রজাপতি ব্রহ্মা একদা বলেছিলেন যে—আত্মা পাপবিহীন, জরাবিহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসামুক্ত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। তাঁকেই ভালভাবে জানতে হবে। তাঁকেই সকলেরই বিশেষ ভাবে জানার আগ্রহ করা উচিত। যিনি শাস্ত্র অনুসারে ও শ্রীগুরুর নির্দেশিত পথে চলে এই আত্মাকে জানতে পারেন এবং তাঁকে বিশেষভাবে অনুভব করতে পারেন, তিনি সমস্ত লোক, সমস্ত কাম্য, লাভ করেন।

প্রজাপতির এই বিশেষ কথাটি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। তারপর এক সময় সেটি এসে যায় দেবতা এবং অসুরদের কানেও। দেবতাদের গুণের সীমা নেই, তাঁরা লোক-সমাজের কল্যাণও করেন। কিন্তু ভোগের কথা ভুলতে পারেন না। তাঁরা ভাবলেন যদি এই আত্মাকে জানলেই সব জানা হয়ে যায়, সব কিছু পাওয়া হয়ে যায়, ইচ্ছামত সব জিনিষ হাতে এসে যায়, তাহলে তখন তো আর কোন কিছুই পাওয়ার জন্য ভাবনা থাকবে না। সুতরাং আর মোটেই দেরী না করে প্রজাপতির কাছ থেকে আত্মবিদ্যা শিক্ষা করতে ইন্দ্র চললেন বিদ্যার্থীর বেশ ধরে। হাতে নিলেন যথারীতি সমিধ।

আর অসুরদের তো ওই কথা শোনার পর আর আনন্দের শেষ নেই। ভোগের প্রতি তাদের আসক্তি চিরকালই বেশি। তারা ভোগই ভালবাসে। তারা ভোগ ছাড়া অন্য কিছু বুঝতেই চায় না। তাদের মতে এই সুন্দর পৃথিবীটা তৈরী হয়েছে ভোগেরই জন্য। তারা যখন দেখল এই আত্মবিদ্যা আয়ত্ত করলেই সবকিছুই পাওয়া আরও সহজ হয়ে যাবে, তখন আর কি দেরী সহ্য হয়। যেন আত্মবিদ্যা একেবারেই সহজ জিনিষ। প্রজাপতির কাছে গেলেই পাওয়া হয়ে যাবে। তাই আর দেরী না করে দানবদের পক্ষে দানবরাজ বিরোচনও সমিধ হাতে

চললেন প্রজাপতির কাছে।

যাওয়ার সময় দুজনেই দুজনকে না জানিয়েই চলে যান। তবে, দু'জনে দুজনকেই লুকিয়ে গেলেও প্রজাপতির কাছে গিয়ে কেউ কিন্তু আর কারও অজানা রইলেন না।

প্রজাপতির কাছে যাওয়ার পর দুজনেরই বত্রিশ বছর ধরে ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ হল। কারণ ব্রহ্মচর্য ছাড়া আত্মবিদ্যা লাভ করা যায় না। আগে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া থাকলেও দুজনেই প্রজাপতির কাছে এসে মিলে মিশেই থাকতে লাগলেন এবং ব্রহ্মচর্য পালন ও গুরুসেবাও করতে থাকলেন। এভাবে বত্রিশ বছর কেটে গেলে একদিন প্রজাপতি তাঁদের বলেন—তোমরা যে এখানে এই ভাবে কষ্ট করে এতদিন আছ— তার কারণ কি? তোমাদের কি প্রয়োজন?

তাঁরা তখন বললেন—ভগবন্, আপনি যে বলেছেন যে আত্মা পাপবিহীন, জরাবিহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসামুক্ত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প তাঁরই অনুসন্ধান করা উচিত ; তাঁকেই বিশেষভাবে সকলের জানার আগ্রহ করা উচিত। যিনি ওই আত্মার পরিচয় লাভ করে তাঁকে অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করতে পারেন। সেই আত্মাকে জানার জন্যই আমরা এখানে আপনার কাছে এসে বাস করছি।

প্রজাপতি তাঁদের প্রার্থনা শুনে বললেন—চোখ দিয়ে এই যে পুরুষকে দেখা যায় ইনিই আত্মা। এই আত্মাই অমৃত ও অভয়। ইনিই ব্রহ্ম।

তাঁরা প্রজাপতির কথার ভাব ঠিক মত বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন—এই জলে বা এই আয়নায় যাঁকে ঠিক নিজের মতই দেখা যায়, এঁদের মধ্যে আপনার কথিত আত্মা কোন্ জন?

প্রজাপতি বললেন—এই আত্মাকে সবকিছুর মধ্যেই দেখা যায়।

প্রজাপতি তাঁদের আরও ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন—তোমরা জলপূর্ণ পাত্রে তোমাদের নিজেদের প্রতিবিম্ব আগে দেখ। তারপরও যদি তোমাদের এ বিষয়ে বুঝতে কোন অসুবিধা হয়, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে।

তাঁরা তখন দুজনেই জলপূর্ণ পাত্রের নিকটে গিয়ে নিজেদের ভালভাবে দেখতে লাগলেন। তারপর তাদের দেখা হলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন—তেমরা কি দেখলে?

তাঁরা উভয়েই বলে উঠলেন—আমরা সমগ্ররূপেই আত্মাকে দর্শন করলাম। এমনকি লোম, নখ থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই যেন একেবারে হুবহু আমাদেরই মত।

প্রজাপতি বললেন—এবার তোমরা নিজেরা বেশ ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও, তারপর ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ ও রত্ন-অলঙ্কারে সেজে জলের দিকে তাকাও। তাঁরাও সেরকমই করলেন।

প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করেন— তোমরা জলে কি দেখছ? তাঁরা দুজনেই আনন্দে বলে উঠলেন—আমরা দু'জনই যেমন এই সুন্দর অলঙ্কারে সুসজ্জিত, আমাদের পরিধানে সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসন-ভূষণ, জলের ভিতর তাঁরাও ঠিক সেরকমই। প্রজাপতি বললেন—এই আত্মাই অমৃত ও অভয়। ইনিই ব্রহ্ম।

প্রজাপতির কাছে এসে আত্মদর্শন ও ব্রহ্মদর্শন হয়ে গেল মনে করে দু'জনেই মহানন্দে নাচতে নাচতে চলে গেলেন।

তাঁরা চলে গেলে প্রজাপতি মনে মনে ভাবলেন — এরা আত্মাকে প্রত্যক্ষ না করে দুজনেই চলে যাচ্ছে। দেবতা বা অসুর যারাই ওই রকম উপনিষৎ গ্রহণ করবে, তারাই পরাজিত হবে।

অসুরদের রাজা বিরোচন তো একেবারে নিশ্চিন্ত যে, তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি সমস্ত অসুরদের ডেকে তাঁদের নিজের

শরীর দেখিয়ে উপনিষৎ সম্পর্কে জ্ঞান দিতে গিয়ে বললেন—ইহলোকে এই আত্মার (অর্থাৎ দেহেরই) পূজা করা উচিত। এবং এরই সেবা করা উচিত। এই জগতে এই আত্মাকে পূজা করলে ও এর সেবা করলে ইহলোক, পরলোক, উভয়লোকই অনায়াসে জয় করা যায়।

সেজন্যই আজও দানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও যজ্ঞহীন ব্যক্তি সম্পর্কে লোকে বলে—"এই লোকটি সত্যই অসুর-স্বভাবের", কারণ তার জীবনদর্শন আসুরী উপনিষৎ। তাই তারা ওই মরা লোকটিকে ভালো ভালো খাবার, ভালো কাপড় ও অলঙ্কারে সাজায়। যেহেতু তাদের ধারণা এরকমই যে—এই লোকটি এই শবশয্যাতে থেকেই পরলোক জয় করবে।

দেবরাজ ইন্দ্র কিন্তু রাস্তায় যেতে যেতেই চিন্তা করছেন—ঠিক যেমন এই শরীরটি সুন্দরভাবে অলঙ্কারে সাজিয়ে নিলে তার ছবিটিও উত্তম অলঙ্কারে সাজানো হয়, দেহটিকে সুন্দর বসনে সাজালে ওই ছবিটিও সুন্দর বসনে সুসজ্জিত হয় এই দেহ পরিষ্কার করা হলে তারও দেহ পরিষ্কার হয়, ঠিক তেমনি দেহ অন্ধ হলে ওই ছায়া অন্ধ হয়, অঙ্গহীন হলে অঙ্গহীন হয় এবং এই শরীরের বিনাশ হলে ওই শরীরও বিনাশ হয়। না, মনে হচ্ছে এই বিদ্যা ভাল নয়।

ইন্দ্রের মনে এরকম চিন্তা হওয়ায় তিনি স্বর্গে না গিয়ে পুনরায় সমিধ নিয়ে ফিরে এলেন প্রজাপতির কাছেই। প্রজাপতি ইন্দ্রকে পুনরায় আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—ইন্দ্র, তুমি তো আনন্দ মনে বিরোচনের সঙ্গে চলে গিয়েছিলে, আবার কি মনে করে ফিরে এলে?

ইন্দ্র বললেন—ঠিক যেমন এই দেহ সুন্দরভাবে অলঙ্কারে সাজানো হলে ছায়াদেহও অলঙ্কৃত হয়, সুন্দর বসন-ভূষণ পরলে সেও সুন্দর বসন-ভূষণ পরিহিত হয়, পরিষ্কৃত হলে পরিষ্কৃত হয়, তেমনি দেহ অন্ধ হলে, কানা হলে সেও অন্ধ হয়, কানা হয়, অঙ্গহীন হলে অঙ্গহীন

হয়, দেহ বিনষ্ট হলে ওই আত্মাও সেরকমই বিনষ্ট হয়। আমি এই ছায়াত্মার জ্ঞানে ভাল ফল দেখছি না।

প্রজাপতি শুনে বললেন—হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। তোমার কাছে আত্মার বর্ণনা করে আমি বলতে পারি, তবে সেজন্য তোমাকে এখানে আরও বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য নিয়ে থাকতে হবে।

ইন্দ্র আরও বত্রিশ বছর প্রজাপতির কাছে থাকলেন।

বত্রিশ বছর পার হয়ে গেলে প্রজাপতি তাঁকে বললেন—ঘুমের সময় স্বপ্নে যে পূজ্যমান পুরুষকে বিচরণ করতে দেখ, তিনিই আত্মা। তিনি অমৃত, অভয়। তিনিই ব্রহ্ম।

দেবরাজ ইন্দ্র ভাবলেন—এবার বুঝি সঠিক জিনিষই পেয়েছি। তাই তিনি খুশি মনেই চলে গেলেন। মনে মনে তাঁর চিন্তা হচ্ছে—আত্মা হলেন স্বপ্ন-পুরুষ। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই তাঁর মনে হল—যদিও এই শরীর অন্ধ হয়, কিন্তু স্বপ্নাত্মা তো অন্ধ হন না। দেহ কাণা হলেও তিনি কাণা হন না। এবং এর দোষে তিনি দুষ্ট হন না, এই দেহ হত হলে—তিনি হত হন না। দেহের অশ্রু ঝরলেও তাঁর অশ্রু ঝরে না। তবুও অপরে যেন একে হত্যা করে, যেন তাড়া করে বেড়ায়। পরন্তু, ইনি যেন দুঃখ অনুভব করেন ও কাঁদেন। সুতরাং আমি এই জানার মধ্যে ভাল ফল দেখছি না।

ইন্দ্র পুনরায় প্রজাপতির কাছেই ফিরে এলেন।

প্রজাপতি তাঁকে বললেন হে ইন্দ্র, তুমি তো মনের আনন্দে চলে গিয়েছিলে। কিন্তু আবার ফিরে এলে কেন?

ইন্দ্র বললেন হে ভগবন্,—যদিও এই দেহ অন্ধ হলে স্বপ্নাত্মা অন্ধ হয় না, এটি কাণা হলেও তিনি কাণা হন না, এর দোষ তাকে দূষিত করে না, এর বধ হলে তিনি হত হন না, এর অশ্রু ঝরলেও তাঁর অশ্রু ঝরে না, তবুও অপরে যেন এই স্বপ্নাত্মাকে হত্যা করে,

বিতাড়িত করে। তিনি যেন অপ্রিয় বিষয় অনুভব করেন ও কাঁদেন। সুতরাং আমি এতে প্রকৃত কোন ইষ্টফল দেখছি না।

প্রজাপতি বললেন— হে ইন্দ্র, এটি এই রকমই বটে। আমি তোমাকে আত্মার বিষয়ে সন্দেহ-শূন্য করে দেব। কিন্তু সেজন্য তোমাকে আরও বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে আমার এখানে থাকতে হবে।

ইন্দ্রের আরও বত্রিশ বছর সেখানে ব্রহ্মচর্য পালন হলে প্রজাপতি তাঁকে বললেন—মানুষ যখন গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে, তখন সে স্বপ্ন দেখা থেকেও বিরত থাকে। যে পুরুষ সম্যক্ভাবে প্রসন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখা থেকেও বিরত হন তিনিই আত্মা। এই আত্মাই অমৃত ও অভয়। ইনিই ব্রহ্ম।

ইন্দ্র মনের আনন্দে চলে গেলেন। এবার নিশ্চয়ই তিনি আত্মার সঠিক তত্ত্বই জেনেছেন। তাড়াতাড়ি চলেছেন দেবতাদের জানাতে সেই আত্মার বিষয়। কিন্তু দেবতাদের কাছে পৌঁছানোর আগেই আবার তাঁর যেন মনে হল—ইনি নিজেকে আমি এ-রকম এভাবেও যেমন জানেন না, তেমনি এসকল প্রাণীদেরও জানেন না। তাছাড়া ইনি তো বিনাশ পান। কিন্তু আত্মার যে বিনাশ নেই। না, নিশ্চয় এর মধ্যে একটা কিছু গরমিল আছে।

আবার সমিধ হাতে ইন্দ্র প্রজাপতির কাছে ফিরে এলেন।

প্রজাপতি ইন্দ্রকে পুনরায় ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে ইন্দ্র, তুমি তো আনন্দিত মনে চলেই গিয়েছিলে, আবার আমার কাছে ফিরে এলে কেন?

ইন্দ্র বললেন—আপনি আত্মার বিষয়ে এবার যে উপদেশ দিয়েছেন, তিনি নিজেকে আমি এ-রকম এভাবেও যেমন জানেন না, তেমনি এ সকল প্রাণীদেরও তিনি জানেন না। সুতরাং তিনি

যেন বিনাশ পাচ্ছেন। কিন্তু আত্মা তো অবিনশ্বর। তাই আমি এরও মধ্যে কোন শুভ ফল দেখছি না।

প্রজাপতি বলেন—তুমি যা বলেছ তাই সঠিক। আমি তোমাকে পুনরায় আত্মার তত্ত্ব সম্বন্ধে বলব। তবে তোমাকে এখানে আরও পাঁচ বছর ব্রহ্মচর্য নিয়ে থাকতে হবে।

ইন্দ্র সেখানে আবার পাঁচ বছর থেকে গেলেন। এই পাঁচ বছর নিয়ে ইন্দ্রের ব্রহ্মচর্য জীবনের একশ এক বছর পার হয়ে গেল। যে জন্য লোকে তাঁর সম্পর্কে বলে—ইন্দ্র প্রজাপতির কাছে একশ এক বছর ছিলেন।

এরপর প্রজাপতি বলতে থাকলেন—হে ইন্দ্র, আমাদের এই শরীর মরণশীল, এ শরীর মৃত্যু-কবলিত। কিন্তু এই শরীরের মধ্যেই আছেন সেই অমর ও অশরীর আত্মা। যিনি শরীরযুক্ত— তিনিই সুখ-দুঃখগ্রস্ত হন, তাঁর সুখ-দুঃখের বিরাম নেই। আর যিনি শরীরবিহীন তাঁকে সুখ বা দুঃখ কোনটিই স্পর্শ করে না।

বায়ু শরীরবিহীন, সূক্ষ্ম ; মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘের গর্জন এরাও দেহহীন। এরা অশরীর বলেই এরা যেমন ওই আকাশ থেকে সৃষ্ট হয়ে প্রখর সূর্যের তেজ যখনই পায়, তখনই আপন আপন শরীরে ও স্বরূপে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। কিন্তু নীল আকাশের সঙ্গে এরা যখন নীল হয়ে যায়, তখন এদের আর খুঁজে পাওয়া যায় কি?

ইন্দ্র, তোমাকে পূর্বে সুষুপ্তি সময়ের যে আত্মার কথা বলেছিলাম, তিনিও সেই উত্তম পুরুষ। তিনি নিজের স্বরূপে অবস্থান করে হাস্যক্রীড়া অথবা আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে আনন্দ করলেও এই দেহের কথা তাঁর মনেও থাকে না। এমন-কি পিতা-মাতা থেকে সৃষ্ট এই শরীরের কথাও ভুলে তিনি ভ্রমণ করেন। অবশ্য তিনি দেহছাড়া নন। অশ্ব যেমন রথের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তেমনি প্রাণও এই দেহের

সঙ্গে সংযুক্ত।

তোমাদের প্রথমে বলেছিলাম—চোখে যে পুরুষ অবস্থান করেন তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃত-অভয়। চোখ বলতে আমি তোমাদের এই যে বাহ্য বস্তু দেখার চোখ তাকে বলিনি। চোখের ভিতরে কৃষ্ণতারকা নামে পরিচিত দেহের ছিদ্রের মধ্যে যে আকাশ সেখানেই থাকেন চোখের অধিষ্ঠাতা উক্ত আত্মা তিনি যদি দেখার ইচ্ছা করেন, তবেই চোখ দেখে। তিনি দেখেন, চোখ শুধু মাধ্যম মাত্র। দেহের মধ্যে অবস্থান করে ওই আত্মাই ঘ্রাণেন্দ্রিয় দিয়ে গন্ধ নেন, বাগিন্দ্রিয় দিয়ে কথা বলেন, শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে শোনেন। তাঁরই ইচ্ছা পূরণ করে ওই ইন্দ্রিয়গুলি।

আর যিনি জানেন—আমি চিন্তা করি, তিনিই আত্মা। মন তাঁর দৈব চক্ষু। সেই মনরূপ চক্ষু দিয়ে মানুষ কত কিছু দেখে, অনুভব করে। কিন্তু এসব কিছুই মন করে না। করেন এই মানব দেহের মধ্যে যে আত্মা আছেন সেই আত্মাই। যা কিছু আছে তা দর্শন করে আনন্দ পান।

এই আত্মাকেই দেবতারা উপাসনা করেন। যেজন্য সকল লোক এবং সকল কাম্য বস্তু তাঁদের অধীন হয়েছে। যে কেউ ওই আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্যের কাছে জেনে বিশেষভাবে অনুভব করেন তিনিই সকল লোকের সকল কাম্যবস্তুই লাভ করেন।

আত্মবিদ্যা-বিষয়ক এই সুন্দর উপাখ্যানটিতে প্রজাপতি বারংবার ব্রহ্মচর্য পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যার মধ্য দিয়ে তিনি যেন বলেই দিয়েছেন যে — কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন ছাড়া এই আত্মবিদ্যা আয়ত্ত বা অনুভব কোনটিই সম্ভব নয়। আর ইন্দ্রও সেই একশ এক বছর কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্য দিয়ে আত্মবিদ্যা আয়ত্তের দৃষ্টান্ত হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে যাঁর কথা না বললেই নয়—তিনি হলেন স্বামী প্রণবানন্দজী, যিনি তাঁর শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতার প্রায় প্রতিটি পাতায় পাতায় আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী মানুষকে উপনিষদের এই অন্যতম মূল কথা ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য বার বার বলেছেন। তাঁর বক্তব্যই হল—**"বীর্য্যই জীবন, বীর্য্যই প্রাণ, বীর্যই মানুষের যথাসর্বস্ব। বীর্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই বীর্য্য রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হয়, এই বীর্য্য নষ্ট করিলেই মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।"** তিনি আরও বলেন—**ব্রহ্মচর্য্যের ভিতরই মানুষের মনুষ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, বীরের বীরত্ব।** তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ডাক দিয়ে বলেছেন—

ভারত! ভুলিও না, তুমি ঋষির বংশধর। তোমার ধর্ম্ম ও সমাজ, শিক্ষা ও সভ্যতা ঋষির হস্তে গঠিত। ঋষির সনাতন অনুশাসনে অনুশাসিত, পরিচালিত। তোমার জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি কর্তব্য ঋষি-নির্দিষ্ট। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যই তোমার সনাতন আদর্শ, তোমার জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র। ঐ আদর্শকে জীবনপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাক। পড়িয়া গেলেও তোমার বিনাশ নাই। পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী।

এবং তাঁর যুগমন্ত্র সঙ্ঘবাণীতে ধর্মের সংজ্ঞায় **"ব্রহ্মচর্য"** হল চতুর্থ স্তম্ভ।

ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে

শ্রদ্ধাবান জানশ্রুতি

পুরাকালে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ছিলেন মহাবৃষ রাজ্যের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। তাঁর মত শ্রদ্ধাশীল ও দাতা রাজার নাম খুব কমই শোনা যায়। তাঁর দানশীলতার খ্যাতি শুধু তাঁর রাজ্যেই নয়, পরন্তু রাজ্যের বাইরেও বহু স্থানের লোকেরাও তা জানত। তাঁর রাজ্যের কোন প্রজা যাতে খাওয়ার জন্য কষ্ট না পায়, থাকার জন্য বাড়ী পায়—সেজন্য তিনি বহু জায়গায় অন্নশালা, পান্থশালা তৈরী করেছিলেন। শুধু তৈরী করাই নয়, সেখানে যাতে ঠিক মত রান্না হয়, কেউ যাতে না খেয়ে না থাকে, কোথাও খাদ্যের যেন অপচয় না হয়—এ সবেরই তিনি নিজে তদারকি করতেন। সেজন্য রাজ্যের সকলেই তাঁকে ধন্য ধন্য করত। সকলেই তাঁর প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। এমন-কি তাঁর পুণ্যের তেজোময় দীপ্তি আকাশেও ছড়িয়ে পড়ে।

একদিন রাত্রে দুটো হাঁস আকাশে উড়ে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় যখন তারা অন্য রাজ্য থেকে রাজা জানশ্রুতির রাজ্যে প্রবেশ করছিল তখন পিছনের হাঁসটি সামনের হাঁসটিকে সাবধান করে দিয়ে বলে—ভল্লাক্ষ! দেখ, রাজা জানশ্রুতির পুণ্যবলে সামনের আকাশ কি রকম আলোয় দীপ্ত হয়ে আছে। যেন সূর্যের আলোর মত তেজোময় দীপ্তি! একবার যদি ওই তেজের ছোঁওয়া আমাদের গায়ে লাগে তাহলে আর রক্ষা নেই। আমাদের শরীর নিশ্চয়ই দগ্ধ হয়ে যাবে।

ভল্লাক্ষ বলে, দূর—ওটা এমন কি তেজ যে শরীর দগ্ধ হয়ে যাওয়ার মত ভয় পাব? যদি শকটবান্ রৈক্ক হত তা হলে তবুও না হয় চিন্তার বিষয় ছিল। আর এ-রাজা এমন কি যে একে তুমি শকটবান রৈক্কের সমান মনে করছ?

শুনে দ্বিতীয় হাঁস প্রথম হাঁসকে জিজ্ঞাসা করে শকটবান্ বা শকটযুক্ত রৈক্ক আবার কে?

উত্তরে প্রথম হাঁসটি বলে—কৃত নামে পাশা খেলা কি তুমি দেখেছ? সেই খেলায় যে জয়ী হয়, সব দানই যেমন তার কাছে চলে যায়, যে যেখানে যে ভাল কাজই করুক না কেন, পুণ্যের কাজই করুক না কেন, তার সবেরই অধিকারী হয়ে যান রৈক্ক। সেজন্যই রৈক্ক যা জানেন, অন্য কেউ যদি তা জানে, তবে আমি তাকে রৈক্কের মত বলি।

রাতে দুই হাঁসের ওই আলোচনা রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের অজানা রইল না। তিনি নিজের কানেই তা শুনলেন। তারপর সকাল হতেই গায়কেরা যখন তাঁর গুণকীর্তন করছেন, সে-সময় বিছানা ছেড়ে উঠে ডাকলেন তিনি দ্বারপালকে। বললেন— কাল রাতে দুই হাঁসের আশ্চর্য কথাবার্তা শুনলাম। একটি হাঁস তো আমার যে পুণ্য কর্মফল তাকেও তুচ্ছ করে বলল—এ-রাজা এমন কি যে, একে তুমি শকটবান্ রৈক্কের সঙ্গে তুলনা করছ? অন্য হাঁসটি তখন তার কাছে রৈক্কের পরিচয় জানতে চাইল সে বলে—যে যেখানে যেমন ভাল কাজই করুক না কেন, যত পুণ্যের কাজই করুক না কেন, সব চলে যায় রৈক্কের অধীনে—কৃত-নামে পাশাজয়ের মত। তিনি নাকি খুবই জ্ঞানী। ওই হাঁসের কথা শোনার পর থেকে আমার মন খুবই উদগ্রীব হয়ে আছে তাঁকে জানার জন্য। তুমি এখনই খোঁজ নিয়ে এস, সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কোথায় আছেন?

দ্বারপাল তার বুদ্ধিমত যেখানে যেখানে খোঁজা উচিত মনে করল সে সকল জায়গাগুলিতেই রৈক্কের খোঁজ করল। কিন্তু না পেয়ে এসে রাজাকে জানায়—না মহারাজ, রৈক্কের খোঁজ পেলাম না।

তখন রাজা বললেন—ব্রাহ্মণেরা যে-সব স্থানে থাকেন, সে-সকল স্থানে কি তাঁর খোঁজ নেওয়া হয়েছে? তাঁরা তো লোকালয়ে থাকেন না। তাঁরা থাকেন হয় কোন নির্জন স্থানে, অথবা বনে। ওই সকল জায়গায় যে রৈক্কের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে তা দ্বারপাল

ভাবতে পারেনি। তাই রাজার আদেশ পালনে আবার রওনা হল রৈক্কের খোঁজে।

ঘুরতে ঘুরতে দ্বারপাল দেখতে পায় জনপদ থেকে দূরে নির্জন জায়গায় একটি গাড়ীর নীচে একজন মানুষ বসে আছেন। তাঁর সারা গায়ে খোস পাঁচড়ায় ভর্তি। আপন মনে তিনি সেসব চুলকে চলেছেন। তাঁর যা চেহারা দেখলে ভক্তি তো দূরে যাক্, শরীর ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে। তবু তার মনে হল ইনি যখন শকটবান্—তখন ইনিও তো রৈক্কই হতে পারেন।

দ্বারপাল তাই নিজের মনের ভাব মনেই গোপন রেখে অত্যন্ত বিনয় সহকারে সেই মানুষটিকে সম্ভাষণ করে জানতে চাইল ভগবন্, আপনি শকটবান্ রৈক্ক?

খোস চুলকাতে চুলকাতেই তিনি বললেন—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ আমিই।

দ্বারপাল আর তাঁর সঙ্গে কোন কথা না বলে এবং কোনরকম দেরী না করে এসে খবর দিল মহারাজকে।

রৈক্কের খোঁজ পেয়ে রাজা জানশ্রুতি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই ছয়শ গাভী, একগাছা সোনার হার, আর অশ্বতরীবাহিত একটি রথ নিয়ে উপস্থিত হলেন রৈক্কের কাছে। তারপর তাঁকে যথাবিহিত সম্মান জানিয়ে বললেন — হে ভগবন্, আপনার জন্য এগুলি এনেছি। দয়া করে এগুলিকে দক্ষিণারূপে গ্রহণ করে আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, তাঁর সম্বন্ধে আমায় কিছু উপদেশ দিন।

রৈক্ক তাকে উত্তর দিলেন—রে শূদ্র, গাভিগণসহ হার ও রথ তোমারই থাকুক।

রাজা ভাবতে পারেননি যে, রৈক্ক তাঁকে এরকম কঠোর কথা বলবেন। কিন্তু তবু তিনি নিরুৎসাহ হলেন না। রৈক্ক প্রত্যাখ্যান করায়

যা এনেছিলেন সবই নিয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু আবার তিনি ফিরে এলেন। এবার সঙ্গে এক সহস্র গাভী, সোনার হার, অশ্বতরীবাহিত রথ আর তার সঙ্গে দিলেন নিজের কন্যাকেও। সেই সঙ্গে রৈক্ক যে গ্রামে বাস করতেন সেই গ্রামও তাঁকে দিয়ে তিনি বললেন এই দান আপনি গ্রহণ করে আমাকে উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করুন। আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, সেই দেবতা সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞান দান করুন।

এবার রৈক্ক প্রসন্ন মনে রাজার দান গ্রহণ করলেন। তিনি যে গ্রামে থাকতেন সেদিন থেকে সে গ্রামের নাম হল রৈক্কপর্ণ। সেখানেই রৈক্ক রাজাকে সম্বর্গবিদ্যা অর্থাৎ লয়স্থান, অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা বিষয়ক ক্ষেত্র ; তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে কে কিসে লীন হয়ে যাচ্ছে রৈক্ক সে-বিষয়ে রাজাকে পরম জ্ঞান দেন। তার অল্প কিছু এখানেও উল্লেখ করা হল—

বায়ু সম্বর্গ। সর্বব্যাপী, সর্বগত। বায়ুদেবতা সকলকে গ্রাস করেন, সকলের লয়স্থান। অগ্নি যখন নিভে যান তখন বায়ুতেই লীন হন। চন্দ্র যখন অস্ত যান তখন বায়ুতেই লীন হন।

যখন জল শুকিয়ে যায়, তখন তা বায়ুতেই লীন হয়। কারণ বায়ুই এই সমস্তকে আত্মসাৎ করেন। এটিকেই দেবগণের মধ্যে সম্বর্গদর্শন বলা হয়েছে।

এরপর শরীরের মধ্যে সম্বর্গদর্শন সম্পর্কে বলছেন—প্রাণই সম্বর্গ। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখন বাক্ বা বাগিন্দ্রিয় প্রাণে লয় হয়, চক্ষু প্রাণে লয় হয়, শ্রোত্রও প্রাণে লয় হয়, এমনকি মনও প্রাণে লয় হয়ে যায়। ....ইত্যাদি।

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই শিক্ষামূলক উপাখ্যানটি শুধু যে সম্বর্গবিদ্যা সম্পর্কেই একটি উল্লেখযোগ্য উপদেশ তাই নয়। এখানে শ্রদ্ধা ও দানের বিষয়টিও বিশেষভাবেই অনুসরণীয়। বিশেষতঃ শ্রদ্ধার

কথাটি। শ্রদ্ধাই মানুষকে জ্ঞানার্জনে সুযোগ করে দেয়।

জানশ্রুতি রাজা। দানশীল ও পুণ্যবান্ রাজা রূপে তাঁর অশেষ খ্যাতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সেজন্য যেমন কোন অভিমান ছিল না, তেমনি জ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধাও তাঁর চরিত্রে অত্যন্ত প্রকট।

এই শ্রদ্ধার জাগরণ যাতে প্রতিটি মানুষের মধ্যে জাগে, যাতে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়, রাজা জানশ্রুতির মত শ্রদ্ধাশীল হয়—সেজন্য স্বামী প্রণবানন্দজী বিশেষভাবেই বলেছেন এবং সেজন্য দেশব্যাপী গুরুপূজার প্রচলন ও প্রচারের ব্যবস্থাও করেছেন। তিনি দেখেছিলেন—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্। **তাই বলেছেন— শ্রদ্ধার জাগরণ না ঘটিলে কোন উপদেশ, কোন আদর্শ, কোনো সাধনা ফলপ্রসূ হইবে না। জাতির জীবনে এই শ্রদ্ধার প্লাবন সৃষ্টি চাই : এজন্য চাই গুরুপূজার বিরাট সমারোহ ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা।**

ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে

ব্রহ্মিষ্ঠতম যাজ্ঞবল্ক্য

রাজা জনকের নাম আমরা অনেকেই জানি। তাঁর রাজ্যের নাম ছিল বিদেহ। তিনি ছিলেন সম্রাট। জনককে শুধু রাজা বা সম্রাট বললেই তাঁর পুরো পরিচয় হয় না, পরন্তু তিনি ছিলেন পরম জ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানী। তার জন্যই তাঁকে ঋষিও বলা হয়ে থাকে। যেজন্য তাঁর সঠিক পরিচয় হল রাজর্ষি জনক। তিনি নিজে রাজা এবং ঋষি হওয়ায় তাঁর রাজসভাও একাধারে কর্ম ও জ্ঞানের মিলনক্ষেত্র ছিল। তাঁর রাজসভায় সব সময় ঋষি ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সমাদর ছিল খুবই বেশি।

আজকাল দেশে মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য স্কুল-কলেজ কত কিছুর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেকালেও যে ছিল না তা নয়। সেকালেও বহু নারীর নাম পাওয়া যায় যাঁরা ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারিণী। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যা হলেন মৈত্রেয়ী, গার্গী, বাক্, অপালা প্রভৃতি। এবং আজকের মত পণ্ডিতদের সভায় সেকালে মেয়েরাও যোগ দিতে পারতেন, শাস্ত্র আলোচনাও করতেন। তাঁদের যথেষ্ট মর্যাদা ও সমাদর ছিল।

বিদেহ রাজ জনক একবার বিরাট এক যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সেই যজ্ঞে তিনি বহু কিছু দান করবেন। যজ্ঞে কুরু এবং পাঞ্চাল দেশ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, জ্ঞানী-গুণী-সজ্জন প্রভৃতি। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা চাকুরী, ব্যবসা বা চাষের কাজ করতেন না। তাঁরা শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যাত্ম সাধনার মধ্য দিয়েই দিন কাটাতেন। আর তাঁদের সেই শাস্ত্রজ্ঞান এবং ঈশ্বর সাধনার ফল তাঁরা সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য বিলিয়ে দিতেন। তাই তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের যে সকল প্রয়োজন তা মিটত রাজা জনকের মত দানশীল রাজাদের মহৎ দানেই।

রাজা জনকের দান করতে গিয়ে হয়তো চিন্তা হয়েছে — এতগুলি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সমাবেশ আজ এখানে হয়েছে—যা সহজে হয় না, সুতরাং একটু শাস্ত্র আলোচনা হলেও হয়তো ভালই হয়। তাছাড়া এখন বিদ্যার সর্বোচ্চ শিখরে কে অধিষ্ঠিত — তাও ওই আলোচনার ফলেই বোঝা যাবে। বোঝা যাবে কে ব্রহ্মিষ্ঠতম। যিনি ব্রহ্মিষ্ঠতম বলে প্রমাণিত হবেন, তাঁকে তিনি এক হাজার গাভী দিবেন বলে ঠিক করেন। শুধু গাভীই নয়, গাভীর শিঙ্গুলি দশ দশ পাদ করে সোনা দিয়ে মুড়েও দেবেন। সেভাবেই তিনি আয়োজনও করেন।

যজ্ঞশেষে যখন দানের কাজ চলেছে তখন রাজর্ষি জনক সমবেত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য করে বলেন—হে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ, আপনারা অবশ্যই প্রত্যেকেই ব্রহ্মিষ্ঠ। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবুও আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠতম, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তাঁকে আমি এই গাভীগুলি দান করতে আগ্রহী। অনুগ্রহ করে তিনি এই গাভীগুলি নিয়ে যান।

জনকের কথা শুনে এতজন ব্রাহ্মণ সকলেই নির্বাক, নিশ্চুপ। সভাও পুরোপুরি নিস্তব্ধ। তাঁদের মধ্যে কারও এমন সাহস নেই যে উঠে এসে গাভীগুলি নিয়ে যান। এরকম ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিষ্য সামশ্রবাকে ডেকে বললেন—হে সৌম্য সামশ্রবা, ওই গাভিগুলিকে তুমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাও।

গুরুদেবের আদেশ পেয়ে সামশ্রবা আর এক মুহূর্তও দেরী না করে গাভীগুলিকে নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির বাড়িতে চলে গেলেন। তা দেখে যে সকল ব্রাহ্মণেরা এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, কেউ কোন কথা বলারও সাহস পাচ্ছিলেন না, তাঁরাই যেন ক্ষেপে উঠলেন যাজ্ঞবল্ক্যের ওপর। তাঁরা বলেন—আপনিই যে ব্রহ্মিষ্ঠতম তার কি

প্রমাণ? এ আপনার কি ধরণের আচরণ? একজন বেদজ্ঞানী ব্রাহ্মণ হয়েও আপনার এরকম ব্যবহার? অবশ্য যাঁরা যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞানের পরিধি জানতেন তাঁরা শান্ত হয়েই থাকলেন।

সভায় তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। সেই কোলাহল মুখরিত সভাকে শান্ত করে রাজা জনকের পুরোহিত অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই যে এখানে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠতম সেরকম প্রমাণ না দিয়েই গাভীগুলি নিয়ে গেলে কেন?

ব্রাহ্মণদের আচরণে যাজ্ঞবল্ক্য বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হননি। পরন্তু তিনি প্রসন্ন বদনে বললেন—সকলেই আপনারা ব্রহ্মিষ্ঠ। আপনাদের নমস্কার। গাভীগুলি আমার খুবই দরকার ছিল। তাই যখন কেউই আপনারা গাভীগুলি নিতে এগিয়ে এলেন না, তখন নিরুপায় হয়েই আমাকে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এরকম আচরণই করতে হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের এরকম শান্ত ও সবিনয় উত্তরে যাঁরা ব্রহ্মিষ্ঠ তাঁরা বুঝেছিলেন তিনি যথার্থই জ্ঞানী। এবং জনকও ভাবলেন গোধন দান উপযুক্ত পাত্রেই হয়েছে।

রাজা জনকের পুরোহিত অশ্বল—যদিও তিনি শাস্ত্রজ্ঞানী, কিন্তু অনুভূতি-সম্পন্ন না হওয়ায় এবং তাঁর মনের ক্রোধ, অহঙ্কার বা দম্ভ এসব না যাওয়ায় তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকলেন, আর ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও সে-সব প্রশ্নের উত্তর ধীরভাবে দিতে লাগলেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ প্রশ্ন ও উত্তরের বিস্তৃত তথ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে।

অশ্বলের প্রথম প্রশ্নটি ছিল—বস্তু মাত্রেরই বিনাশ আছে, সকলেই যখন মৃত্যুর অধীন, তখন যজমান কিভাবে মৃত্যুর অধীনতাকে অতিক্রম করবে?

তার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন—যিনি হোতা নামক ঋত্বিক

সেই হোতৃরূপী ও অগ্নিরূপী বাক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। যজমানের বাক্ই হোতা, যজমানের এই যে বাক্ তাই এই অগ্নিদেবতা এবং অগ্নিই হোতা। এই অগ্নিই মুক্তি এবং ঐ মুক্তিই অতিমুক্তি।

এ-ভাবে অনেক প্রশ্ন ও উত্তর চলে। একে একে প্রশ্ন করতে থাকেন অন্য ঋষিরাও। এক সময় কুষীতক বংশের কাহোল প্রশ্ন করেন—সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা তাঁরই কথা আমাকে বিশেষভাবে বলুন।

ঋষি বললেন—আপনার অন্তরে আত্মারূপে যিনি বিরাজ করছেন তিনিই সর্বান্তর (অর্থাৎ তিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত)।

কাহোলের প্রশ্ন—এই সর্বান্তর কে? কি-ভাবে তিনি সর্বান্তর?

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—আমাদের এই শরীরের ধর্ম হল ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু। কিন্তু এই শরীরেই এমন একজন আছেন যিনি এসব কিছুরই উর্ধ্বে। কোনো পরিণাম তাঁকে ভোগ করতে হয় না। তিনি ক্ষুধিত হন না, তৃষ্ণার্ত হন না, শোকগ্রস্ত হন না, মোহমুগ্ধ হন না, জরায় আক্রান্ত হন না বা মৃত্যুমুখে পতিতও হন না। তাই তাঁর কোন পরিবর্তনও নেই। এমন যিনি তিনিই সেই আত্মা। সবার অন্তরে তিনিই বিরাজ করছেন। তিনিই সর্বান্তর।

কাহোল এ বিষয়ে আরও প্রশ্ন করলে যাজ্ঞবল্ক্য বুঝলেন—তিনি সত্যই জ্ঞানের অন্বেষী, শুষ্ক তার্কিক নন। তখন ঋষি আরও বলেন—এই সর্বান্তর আত্মাকে যদি জানতে হয়, উপলব্ধি করতে হয় তবে সকলপ্রকার আকাঙ্ক্ষা বা কামনাকে আগে ত্যাগ করতে হবে। সংসারী মানুষের কামনা কি রকম হতে পারে? পুত্র চাই, ধন চাই, স্বর্গসুখ চাই। যা পুত্রকামনা তাই ধনের কামনা। আবার ধনের কামনা যেখানে, সেখানেই লোককামনা। কামনা সবই সমান। ব্রাহ্মণ হতে হলে এই কামনাকে একেবারে ত্যাগ করতে হবে। দিন যাপন করতে হবে ভিক্ষাবৃত্তির মধ্য দিয়ে। তার মধ্যে যে পাণ্ডিত্য আছে,

অভিমান, অহংকার আছে তাও ত্যাগ করতে হবে। মন হবে পুরোপুরি বালকের মত। তারপর ওই দুই ভাবও ত্যাগ করে মৌনভাব অবলম্বনে হতে হবে মুনি। তার পর তিনি মৌনভাবও ত্যাগ করবেন। সে অবস্থায় তিনি মৌন বা অমৌন যাই হোন না কেন তিনি হয়ে যাবেন ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ।

কাহোল জানতে চান—কি উপায়ে ব্রাহ্মণ হবেন?

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—আত্মদর্শন করেই ব্রাহ্মণ হতে হবে। যাঁর আত্মদর্শন হয়ে যায় তখন তিনি সবকিছুর উপরে। আত্মা ব্যতীত সব কিছুই স্বল্পস্থায়ী, সব কিছুতেই দুঃখ। একমাত্র আত্মাই অবিনশ্বর, আত্মাই অমৃত।

ঋষির উত্তরে পরিতৃপ্ত কাহোল নীরব হয়ে গেলে এবার উঠলেন গার্গী। তিনি ছিলেন বাচক্নু ঋষির কন্যা। তাঁর প্রশ্নগুলি ছিল জগতের যে মূল উপাদান ও কারণ সম্বন্ধে। তিনি বলেন—পৃথিবীতে সবই যদি জলে ওতপ্রোত জল কিসে ওতপ্রোত?

ঋষি বলেন—বায়ুর সঙ্গে ওতপ্রোত।

এভাবে প্রশ্ন-উত্তর চলতে থাকে যেমন—

—বায়ু কোথায় ওতপ্রোত?

—অন্তরিক্ষলোকসকলে অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে ওতপ্রোত।

—অন্তরিক্ষলোকসকল কোথায় ওতপ্রোত?

—গন্ধর্বলোকসকলে।

—গন্ধর্বলোকসকল কোথায় ওতপ্রোত?

—আদিত্যলোকসকলে।

—আদিত্যলোকসকল কোথায় ওতপ্রোত?

—চন্দ্রলোকসকলে।

—চন্দ্রলোকসকল কোথায় ওতপ্রোত?

—নক্ষত্রলোকসকলে।

—নক্ষত্রলোকসকল কোথায় ওতপ্রোত?

—দেবলোকসকলে।

—দেবলোকসকল কোথায় ওতপ্রোত?

—ইন্দ্রলোকসকলে ওতপ্রোত।

—ইন্দ্রলোকসকল কোথায় ওতপ্রোত?

—যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোকসকলে ওতপ্রোত।

—প্রজাপতিলোকসকল কোথায় ওতপ্রোত?

—প্রজাপতিলোকসকল ব্রহ্মলোকসকলে অবস্থিত।

এরপর গার্গী আবার প্রশ্ন করেন—ব্রহ্মলোকসকল কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—ব্রহ্মলোকসকল শেষ সীমা। এরপর আর প্রশ্ন চলে না। অতিপ্রশ্ন করবেন না। আপনার যেন মুণ্ডপাত না হয়। যে দেবতা অতিপ্রশ্নের বিষয় হতে পারেন না, আপনি তাঁর সম্পর্কে অতিপ্রশ্ন করছেন। গার্গী আপনি অতিপ্রশ্ন করবেন না।

গার্গী তখন নীরব হয়ে গেলেন। পরে অবশ্য আরও একবার তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন।

এভাবে সেদিন গার্গীর প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বস্তুর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম যে অবস্থান, তা বিশ্বের সর্বশেষ সত্তা ব্রহ্মে এসে শেষ হয়। এরপর অনেক প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব চললেও শেষে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেরই জয় হয়। তিনিই ব্রহ্মিষ্ঠতম বলে পরিচিত হন।

এই ঘটনা থেকেই বুঝা যায় সেকালে ভারতীয় মুনি-ঋষিগণ তাঁদের কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে কিভাবে চরম সত্যকে উপলব্ধি করে তা ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা আজকের দিনে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিতেও সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু এই যে অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার তা-তো মানুষেরই অন্তরস্থিত গুহায় নিহিত। সেই জ্ঞান, সেই শক্তিকে সাধনার বলে, তপস্যার বলে উদ্‌ঘাটিত করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। তাহলেই মানুষের মনের সামনে বিশ্ব-সৃষ্টির মহারহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়। তখনই মানুষ হয় আত্মজ্ঞানী, মানুষ হয়

ব্রহ্মনিষ্ঠ, মানুষ হয় সত্যদর্শী। উপনিষদ ব্রহ্মনিষ্ঠতম ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে যেন আমাদের সেই শিক্ষাই দিচ্ছেন।

ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বামী প্রণবানন্দজীও যেন উপনিষদের মহান্ আহ্বান জগৎবাসীকে শুনিয়ে দিতে চান। তাই তিনি বলেছেন—**অনন্ত অসীম শক্তি সামর্থ্য, বিপুল বিক্রম পরাক্রম মানুষের ভিতর আছে। কিন্তু ইহার প্রকাশ-বিকাশ না থাকায় মানুষ অনেক সময়ে নিতান্ত নির্জীব ও জড়ের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকে।**

বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে

সত্যকাম-জাবালের সত্যনিষ্ঠা

একদিন সত্যকাম জাবাল তাঁর মা জবালার কাছে গিয়ে বললেন—মা, আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গুরুগৃহে থাকতে চাই। কিন্তু গুরুগৃহে যেতে হলে তো গোত্র জানা একান্তই আবশ্যক। সেজন্য আমার জানার ইচ্ছা যে আমার গোত্র কি? জবালা সমস্যায় পড়েন। কারণ তিনি নিজেও তো নিজের গোত্র জানেন না। তাই তিনি সত্যকামকে বললেন, "তুমি যে কোন গোত্রীয়, তা আমি নিজেও জানি না। বহু কাজের ব্যস্ততা ও পরিচর্যায় রত আমি তোমাকে যৌবনে পেয়েছি। সুতরাং গৌতম ঋষি জানতে চাইলে তুমি বলবে যে, কোন গোত্রীয় তা আমার জানার সুযোগ হয়নি। তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। সুতরাং তুমি সত্যকাম জাবাল বলেই তোমার পরিচয় দিও।

মায়ের কথা মত সত্যকাম মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হরিদ্রুমানের পুত্র হারিদ্রুমত গৌতমের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে তিনি নিজ মনের ইচ্ছার কথা বললেন—ভগবন্, আমি আপনার কাছে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বাস করব, সেজন্যই এখানে এসেছি। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে আপনার শিষ্য করুন।

ঋষি গৌতম তাঁর প্রার্থনা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার গোত্র- পরিচয় কি?

সত্যকাম বলেন—আমার গোত্র-পরিচয় আমি জানি না। মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মা বলেছেন—বহুকাজে ব্যস্ততা ও পরিচরণশীলা আমি তোমাকে যৌবনে পেয়েছিলাম। সুতরাং তুমি যে কোন গোত্রীয় তা আমি নিজেও জানতে পারিনি। তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। সুতরাং মহাশয় আমি সত্যকাম জাবাল।

গৌতম তাঁর কথা শুনে বললেন—এরকম অকপট সত্য কথা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি অবশ্যই ব্রাহ্মণ সন্তান। হে সৌম্য, তুমি সমিধ সংগ্রহ করে আন, আমি তোমায় উপবীত প্রদান করব। তুমি সত্যনিষ্ঠ, সত্য থেকে তুমি ভ্রষ্ট হওনি।

সত্যকাম জাবালা সমিধ আহরণ করে আনলেন। গুরু গৌতমও ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তাঁকে উপবীত দিয়ে বেছে বেছে চারশো ক্ষীণ-শরীর, হাড়গোড় সর্বস্ব, দুর্বল গাভী এনে বললেন—সত্যকাম, তুমি এগুলিকে নিয়ে গোচারণে যাও। সত্যকাম মহানন্দে সেই গরুগুলিকে নিয়ে গোচারণে যাওয়ার সময় গুরুকে বলে গেলেন—ভগবন্ গাভীর সংখ্যা এক হাজার না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার আশ্রমে ফিরব না। গাভীগুলিকে নিয়ে সত্যকামের বহুদিন বাইরে কেটে গেছে। এরপর যখন গরুর সংখ্যা এক হাজার পূর্ণ হয়ে গেল তখন এক বৃষভ একদিন সত্যকামকে ডেকে বলে—হে সত্যকাম, আমরা তো এখন সংখ্যায় এক হাজার পূর্ণ হয়েছি। সুতরাং আর দেরি করা কেন? এবার আমাদের ঋষি গৌতমের ঘরে তুমি নিয়ে চল।

বৃষভ বলল—সত্যকাম, আমি তোমাকে চতুষ্কল ব্রহ্মের একপাদের বিষয়ে উপদেশ দান করতে চাই।

সত্যকাম বলেন—আপনি আমায় উপদেশ দিন।

বৃষভ তাঁকে বললেন—পূর্বদিক এক অংশ, পশ্চিম দিক এক অংশ, উত্তর দিক এক অংশ, দক্ষিণ দিক এক অংশ। হে সৌম্য, এই চারটি দিকের চারটি অংশ বা কলা নিয়ে ব্রহ্মের এক পাদ। এর নাম ‘প্রকাশবান’।

ব্রহ্মের এই চতুষ্কল এক পাদকে যিনি এইভাবে জেনে তাকে প্রকাশশীল বলে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে খ্যাতিলাভ করেন। আর যিনি ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এ-রকমভাবে জেনে তাকে

প্রকাশবান বলে উপাসনা করেন তিনি (পরলোকে) প্রকাশবান্ লোকসকল জয় করেন।

এরকম করে গুরুর কাছে ফিরে আসার পথে বৃষ, অগ্নি, হংস ও মদ্‌গু অর্থাৎ পানকৌড়ি এই চারজনে সত্যকামকে এক এক কলা করে ব্রহ্মের একপাদ বিষয়ে জ্ঞান দিলেন। যাত্রা শুরু করে তিন দিনে সত্যকাম আচার্য গৌতমের কাছে ফিরে এলে গৌতম অত্যন্ত স্নেহভরে সত্যকামকে জড়িয়ে ধরে, আশীর্বাদ করে বললেন—তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে যেন তুমি ব্রহ্মবিদদের মত দীপ্তি পাচ্ছ। কে তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন? সত্যকাম বললেন—ভগবন্, দেহধারী কোন মানুষই আমাকে উপদেশ দেননি। তবে মানুষ ছাড়া অন্য কোন কোন প্রাণী আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। এবার আপনি আমার অন্তরের ইচ্ছা পূর্ণ করুন। আমাকে ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দান করুন।

প্রকৃতির কাছে জ্ঞানলাভ করে ও আচার্য গৌতমকে প্রার্থনা জানিয়ে সত্যকাম বলেন—ভগবন্, আপনাদের মত জ্ঞানীদের কাছেই জেনেছি গুরুর মুখ-নিঃসৃত বিদ্যাই হচ্ছে ফলপ্রদ ও কল্যাণতম। গুরুমুখী জ্ঞানই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

সত্যকামের সবিনয় প্রার্থনায় আচার্য গৌতম প্রসন্ন হলেন ও চতুষ্কল-চতুষ্পাদ ব্রহ্ম সম্পর্কে সত্যকামকে তিনি সে সমস্ত উপদেশই দিলেন, যা দিয়েছিল বৃষ, অগ্নি, হংস ও মদ্‌গু (পানকৌড়ি)। তার কিছু বা কোন অংশই বাদ গেল না।

সত্যকামের প্রার্থনা পূর্ণ হল। যার ফলে তিনি ব্রহ্মতেজে আরো দীপ্তিময় হয়ে উঠলেন।

সত্যই হল পরম তপস্যা। যিনি যত সত্যনিষ্ঠ, সত্যস্বরূপ সনাতন পুরুষকে লাভ করা তাঁর পক্ষে ততই সহজ। উপাখ্যানে উপনিষদের সেই মর্মকথাই আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী শুনিয়েছেন তাঁর সঙ্ঘবাণীর মধ্য দিয়ে। তাঁর সঙ্ঘ-বাণীতে তিনি ধর্মের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন,

তার তৃতীয় কথাই হল সত্য। তিনি ব্রহ্মচারীদের সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ব্রতী করানোর সময়ও প্রত্যেককে শপথের জন্য সঙ্ঘের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীবর্গের যে প্রতিজ্ঞা পঞ্চকের সৃষ্টি করেছেন সেখানেও চতুর্থ শপথ বাক্যটিই হল—**"সতত সত্যকে অবলম্বন করিয়া সত্য-স্বরূপ সনাতন পুরুষকে লাভ করিতে চেষ্টা করিব।"**

ছান্দোগ্য উপনিষদ

রথের উপর বামন দেখা

শাস্ত্র বলছেন—রথের উপর যে বামন বসে আছেন, তাঁকে যদি দর্শন করা যায়, তাহলে আর পুনরায় মানুষকে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। অর্থাৎ, জন্ম-মৃত্যুর এই খেলা শেষ হয়ে যায়। যার সহজ অর্থ ওই বামন দর্শনকারীর মুক্তিলাভ। এখানে, লৌকিক অর্থে অবশ্য বামন বলতে বলা হচ্ছে পুরীর মন্দিরের মূল যে দেবতা সেই—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে।

এ সংসার বড় দুঃখময়, যন্ত্রণাময়। অন্তত যাঁরা নিবৃত্তিমার্গী তাঁরা তাই মনে করেন। সেজন্য তাঁদের আকাঙ্ক্ষা—এ দুঃখ যাতনা থেকে কিভাবে চিরদিনের মত মুক্তি পাওয়া যাবে। তাই যখন তাঁরা শুনেন বা বুঝেন, যে রথের উপর ওই বামন বা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলেই আর তাঁদের পুনরায় জন্ম নিয়ে এ দুঃখের সংসারে ছুটে আসতে হবে না, তখন ছুটে যান পুরীতে—রথের দেবতা বামনকে দর্শন করে তাঁদের মনের আশা পূর্ণ করার জন্য। এভাবেই লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষের সমাবেশ হয়ে আসছে পুরীধামে—যুগ যুগ ধরে। আবার অনেকের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে—শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথের দড়িটিও ধরে টান দেওয়ার। তার মধ্যে যে বাসনা থাকা সহজ সেটি হল—সে যেমন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে, তেমনি প্রভু জগন্নাথও যদি কৃপা করে তাঁর জীবনরথটিকে তাঁর নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেন, তবে তো মুক্তিলাভ দ্রুত হয়ে যায়। এই দুস্তর ভবসাগর অনায়াসে পার হওয়া যায়!

যে রথে বামনকে মানুষরা দেখতে যান, সেই রথে তাঁরা দেখেন—রথের রথী বা রথস্বামী যেমন স্বয়ং প্রভু জগন্নাথ থাকেন, তেমনি থাকেন রথের সারথি একজন। তাঁর হাতে লাগাম ধরা। রথে জুড়ে থাকা ওই অশ্বগুলি রথকে টেনে নিয়ে গেলেও যাতে তারা রথকে

তাদের খেয়াল খুশিমত খাল-বিল-পুষ্করিণীতে না নিয়ে গিয়ে সঠিক পথে, সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যায় সেজন্য তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেই ওই লাগামের ব্যবস্থা। পরন্তু সারথির হাতে রয়েছে চাবুক। যা দিয়ে অশ্বগুলিকে তিনি শাসন করতে পারেন। আরও দেখা যায়—ওই লাগামটি কিন্তু অশ্বগুলির মুখের সঙ্গে -এমনকি নাকেও বাঁধা। অর্থাৎ সারথির অবাধ্য হওয়ার কোন সুযোগ তাদের নেই। তাই নিশ্চিতভাবেই শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথ রাস্তায় এগিয়ে যায়। গুণ্ডিচাবাড়ীতে পৌঁছে যায়—তাতে কোন অসুবিধাই হয় না।

পুরীধামে রথযাত্রার সময় যেমন বামন দেখলে আর মানুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না বলে আমাদের শাস্ত্র বলেছেন, তেমনি উপনিষদ বলছেন—আমাদের এই যে সাড়ে তিন হাতের দেহ বা দেহরথ সেখানেও একজন বামন আছেন। সেই বামনকে যদি দেখা যায় তবে, আর মানুষকে জন্ম নিয়ে এই পৃথিবীর দুঃখ ভোগ করতে আসতে হয় না। এ বিষয়ে কঠোপনিষদে আত্মবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে যম নচিকেতাকে যা বলেছেন—আমাদের এই শরীর একটা রথ। আমাদের যে আত্মা তিনি হলেন সেই রথের রথী। বুদ্ধি এই রথের সারথী। মন হল লাগাম। এবং ইন্দ্রিয়গুলি অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এগুলি হল ওই রথের অশ্ব। তারা এই রথকে স্থির থাকতে না দিয়ে সব সময় টেনে নিয়ে চলেছে। আমাদের দেহ রথের এই যে পাঁচ অশ্ব সেগুলি কোনও বাইরের থেকে এনে জুড়ে দেওয়া নয়। সেগুলি আমাদের শরীরেরই অংশ বা বলা ভাল শরীরেরই সহজাত। কিন্তু এরা বহির্মুখী। তাই রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের প্রতি এদের প্রবল আকর্ষণ। আর সেই আকর্ষণের বশবর্তী হয়ে তারা আমাদের রথকে যেখানে সেখানে টেনে নিয়ে যেতে চায়। তাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সারথি বুদ্ধি এক হাতে মনরূপী লাগাম ও অন্য হাতে বিবেকরূপী চাবুক নিয়ে বসে আছেন। সেই বুদ্ধি যদি কোন সময় সামান্যতম অন্যমনস্ক হন বা লাগাম ছেড়ে দেন তখনই আমাদের

দেহরথ বিপথে যায়। অর্থাৎ মানুষ বিপথগামী হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু সারথী বুদ্ধি যদি শক্ত হাতে লাগাম ধরে থাকতে পারেন, তাহলে এই দেহরথে সমাসীন বামনকে নিয়ে রথ নিশ্চিতভাবেই সেই মুক্তিধামে পৌঁছে যায়। তখন দেখা যায় ওই পাঁচগুণের আকর্ষণে যে ইন্দ্রিয়গুলি দেহরথকে সবসময় বিপথগামী করতে চেষ্টা করে তারাই সঠিক পথে চলে। যার ফলে দেহরথ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাওয়ায় আর মানুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

যাহোক, আমরা পুরীতে রথের সময় যেমন বামনঠাকুর বা জগন্নাথকে দেখি, আমাদের এই দেহরথের সেই বামনঠাকুরকেও কি তেমনভাবেই দেখা যাবে? উপনিষদ বলছেন—হ্যাঁ যাবে। তাহলে সেই বামনঠাকুর বা আমাদের দেহরথের জগন্নাথ দেখতে কেমন? পুরীর বিশাল রথের তুলনায় জগন্নাথ দেখতে একেবারে ছোট। বহু দূর থেকে তাঁকে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় তাঁর রথটুকুই। তাঁকে ঠিকমত দেখতে হলে যেতে হবে রথের আরও কাছে, আরও কাছে— একেবারে তাঁর মূর্তির সামনে। তবে তাঁকে ঠিকমত দেখা যাবে। তবে হ্যাঁ, ওই রথে গিয়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে চাইলেই কি সকলে পারে? পারে না। তার জন্যও অনেক কষ্ট করতে হয়, চেষ্টা, যত্ন, উদ্যোগের প্রয়োজন হয়।

ব্যাপারটা ঠিক সেরকমই, আমাদের এই দেহরথেও যে বামনঠাকুর বা আত্মারূপী জগন্নাথ আছেন তাঁকেও দেখা যাবে। তবে দূর থেকে নয়, যেতে হবে তাঁর যত নিকটে যাওয়া সম্ভব ততখানি নিকটেই। তবে তার জন্য চাই প্রচুর চেষ্টা, উদ্যম, উৎসাহ। কারণ সে পথ খুব দুর্গম। সে-পথে রূপ-শব্দ-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রতি পদে পদে প্রলুব্ধ করছে। তাই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির নাকে-মুখের বাঁধা বিবেকরূপী লাগামকে বুদ্ধি যদি শক্ত করে ধরেন, তাহলেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব। তখন সেখানে আমাদের বামনঠাকুরকে

আমরা দেখতে পাব কোনভাবে? প্রাণও অপান বায়ুর মাঝখানে যেখানে আমাদের হৃদয়, সেই হৃদয় সিংহাসনে আমাদের রাজাধিরাজ আত্মা বা বামনঠাকুর আলো করে বসে আছেন। আর আমাদের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ও ত্বকরূপী ইন্দ্রিয়গুলি যারা রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতির আকর্ষণে আমাদের দেহরথকে বিপথগামী করতে চেষ্টা করছিল, সবাই তখন নানারকমের ভাল ভাল উপহার এনে সেই হৃদয়-পুণ্ডরীকবাসী বামনদেবকে উপহার দিচ্ছে। সেই আত্মারূপী বামন সবসময় জেগে আছেন, তাঁর চোখে ঘুম নেই, তাঁর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবই তাঁর জানা—কিছুই তাঁর অজানা নয়। তিনি অন্তর্যামী অন্তরাত্মা। তাঁর আকৃতি বুড়ো আঙুলের পাবের এক পাব মাত্র। উপনিষদ তাঁকে নাম দিয়েছেন আত্মা বলে। পরম ব্রহ্ম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেরই মত বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে, এমনকি অণু-পরমাণুর মধ্যেও তিনি বিরাজিত। তিনিই সব হয়েছেন। সবার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। তাঁকে আগুনে পোড়ানো যায় না, জল দিয়ে ভেজানো যায় না, রৌদ্রে শুকানো যায় না, তাঁকে হত্যাও করা যায় না এবং তিনি হতও হন না। সেই দিব্যমূর্তি অক্ষয়, অব্যয়, অবিনশ্বর আত্মা বা বামনঠাকুর! তাঁকে একবার দেখলে মানুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এই ভবসংসারের অসহ্য যাতনা আর সহ্য করতে হয় না।

কিন্তু উপনিষদে যমরাজ বলছেন—সেই বামনদেবতাকে একমাত্র যোগসাধনা অর্থাৎ তাঁর সাথে যুক্ত হওয়ার একান্ত চেষ্টা ছাড়া দেখা যায় না। কারণ পরমেশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি আমাদের বাইরের দিকেই টেনে নিয়ে যায়। তাদেরকে বাইরে থেকে ফিরিয়ে এনে আমাদের অন্তর্দেশে, যেখানে ওই দিব্যজ্যোতির্ময় আত্মা বিরাজিত সেদিকে নিয়ে যেতে হয়। একাজ যোগসাধনা ছাড়া সম্ভব হয় না। সেই সঙ্গে সত্য ও তপস্যা তো অবশ্যই

চাই। কারণ তিনি যে সত্যবস্তু। সত্যবস্তুকে কি সত্য ব্যতীত পাওয়া যায়। কিন্তু এজন্য সাধককে বা আত্মদর্শনকারী বা বামনঠাকুরকে দর্শনকারীর খুব চেষ্টা, খুব সংগ্রাম করতে হয়। সংগ্রাম ব্যতীত চেষ্টা ব্যতীত জগতে কেউ কিছুই লাভ করতে পারে না। তাই উপনিষদের প্রতিমূর্তি স্বামী প্রণবানন্দজী সাধককে সাহস যুগিয়ে বলেছেন—

সাধক চায় শক্তি। সেই শক্তি লাভ হয় ভিতর ও বাহিরের সংগ্রাম দ্বারা। যেখানে সংগ্রাম নাই, সেখানে সাধনাও নাই।

সংগ্রাম সাধককে সর্বদা সজাগ রাখে, সংগ্রামই সবসময় সাধককে জাগ্রত করিয়া দেয়। সংগ্রামই সাধকের ভিতরে জাগ্রত জীবন্ত ভাব আনয়ন করে। এই সংগ্রামের অভাব হইলেই সাধক নির্জীব, নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

কঠ উপনিষদ অবলম্বনে

বিশ্বমাঝে চলছে শুধু আত্মারই লীলা

দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের কাছে এসে বলছেন— প্রভু, আপনার কাছে জ্ঞানলাভের জন্য এসেছি, আপনি কৃপা করে আমাকে জ্ঞান দিন। সনৎকুমার বলেন—তুমি যা জান তা আগে আমাকে বল। তারপর তোমাকে প্রয়োজন মত শিক্ষা দেব।

নারদ বলতে থাকলেন— আমি ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, ইতিহাস পুরাণ বেদ- ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, অঙ্কশাস্ত্র, অধিদৈব বিদ্যা, ধনতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্ববিদ্যা প্রভৃতি সবই জানি। কিন্তু প্রভু, আমি এত শাস্ত্রপাঠের পরও শুধু মন্ত্রবিৎই হয়েছি। আত্মবিৎ হইনি। আপনার মত যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ তাঁদের কাছে জেনেছি—যাঁরা আত্মবিদ্ তাঁরা শোককে জয় করতে পারেন। আমি শোকগ্রস্ত, আপনি আমাকে শোকের পরপারে নিয়ে চলুন।

সনৎকুমার বললেন—নারদ তুমি যা কিছু পড়েছ, সবই নামমাত্র। ঋগ্বেদ নামমাত্র, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, ইতিহাস পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, অধিদৈব বিদ্যা, ধনবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্প, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্বশাস্ত্র—এ সমস্তই নামমাত্র। তুমি নামেরই উপাসনা কর। যে লোক নামকে ব্রহ্ম ভেবে উপাসনা করে, নামের যতদূর গতি, তারও ততদূর যেতে কোন বাধা আসে না।

তা শুনে নারদ মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করছেন—প্রভু, নামের চেয়ে আরও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি-না? সনৎকুমার বলেন—অবশ্যই আছে। নারদ তা শুনে বলেন—তাহলে আমাকে তা বলুন।

ঋষি বলেন—বাক্ অবশ্যই নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, তর্কশাস্ত্র, নীতি- শাস্ত্র, জ্যোতিষ. সর্পবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র যদি

বাক্ না থাকত তাহলে কিছুতেই প্রকাশ করা সম্ভব হত কি? পৃথিবী, আকাশ, জল, তেজ, দেবগণ, মানুষ, পশু-পাখি, তৃণ, বনস্পতি, কীটপতঙ্গ, পিপীলিকাসহ হিংস্র জন্তুগণ, পুণ্য ও পাপ, সত্য ও মিথ্যা, শুভ ও অশুভ, মনোরম ও অমনোরম এ সব কোন কিছুকেই প্রকাশ করা সম্ভব হত না। বাক্ই এদের প্রকাশ করে। বাক্ না থাকলে এসব কেউ জানতে পারত কি? তাহলে এসব জানায় বাক্। তাই তুমি বাক্কেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। যিনি বাক্কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বাকের গতি যতদূর, তাঁরও ততদূর গতি হয়ে থাকে। অর্থাৎ তিনিও ততদূর যেতে পারেন।

তা শুনে দেবর্ষি জিজ্ঞাসা করেন—হে ভগবন্, এই বাকের থেকেও শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে কি? ঋষি বলেন—হ্যাঁ, বাকের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে। ঋষি জানতে আগ্রহী হলে তিনি বলেন—

বাকের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হল মন। হাতের মুঠো যেমন দুটি আমলকী বা দুটি বদরী ফলকে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারে, তেমনি মনও বাক্ এবং মন্ত্রকে নিজের মধ্যে ধরে রাখে। কেউ যখন মন্ত্র পাঠ করব এরকম চিন্তা মনে মনে করে তখনই সে মন্ত্র পাঠ করে। যখন কাজ করি বলে কেউ মনে করে তখনই সে কাজ করে ; যখন সে পুত্র কামনা করে বা পশু কামনা করে তখন সে পুত্র পায় বা পশু পায়। মন যখন চায় আমি ইহলোক চাই, আমি পরলোক চাই—তখন সে ইহলোক, পরলোকই লাভ করে। অর্থাৎ মানুষের চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক করে তার মনই। তারপর সে যা কিছু পাওয়ার জন্য কাজ করে। মনই আত্মা, মনই লোক, মনই ব্রহ্ম। তুমি মনের উপাসনা কর। মনকে যে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে যতদূর মনের গতি, সে নিজ ইচ্ছামত ততদূরই যেতে পারে।

নারদ ঋষির কাছে আরও জানতে চান—হে ভগবন্, মনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি-না? ঋষি বলেন—মনের চেয়েও

শ্রেষ্ঠবস্তু অবশ্যই আছে। নারদ বলেন—তাহলে আমায় আপনি তা বলুন।

ঋষি বলেন—মনের চেয়ে বড় হ'ল সঙ্কল্প। লোকে প্রথমে সঙ্কল্প করে। তারপর সে চিন্তা করে। তারপর বাক্‌কে পরিচালিত করে। শেষে বাক্‌কে নাম উচ্চারণে প্রবৃত্ত করায়। সে-সময় মন্ত্রসকল নামে এবং কর্মসমূহ মন্ত্রের সঙ্গে এক হয়ে যায়। সঙ্কল্পই সবকিছুর একমাত্র গতি। সঙ্কল্প থেকেই নাম, বাক্ বা মনের সৃষ্টি। দ্যুলোক ও পৃথিবী সঙ্কল্প করেছে, বায়ু ও আকাশ সঙ্কল্প করেছে, জল ও তেজ সঙ্কল্প করেছে। তাদের সঙ্কল্পে বৃষ্টি সঙ্কল্প করে, বৃষ্টির সঙ্কল্পে অন্ন সঙ্কল্প করে, অন্নের সঙ্কল্পে প্রাণ সঙ্কল্প করে, প্রাণের সঙ্কল্পে মন্ত্র সঙ্কল্প করে। মন্ত্রের সঙ্কল্পে কর্ম সম্পল্প করে। কর্মের সঙ্কল্পে কর্মফল সঙ্কল্প করে, কর্মফলের সঙ্কল্পে সমস্ত জগৎ সঙ্কল্প করে। সবেরই মূল হল সঙ্কল্প। তুমি তাই এই সঙ্কল্পেরই উপাসনা কর। সঙ্কল্পকে যে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে সহজেই তার সঙ্কল্পিত লোকে যায়। ধ্রুবলোকের সঙ্কল্প করলে সে ধ্রুবলোকও পায়। সঙ্কল্পই তাকে প্রতিষ্ঠাশালী লোকসকল এবং ব্যথাশূন্য করে ব্যথাহীন লোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

সঙ্কল্পের থেকেও আরও শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছু আছে কি-না তা জানার আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় দেবর্ষি সনৎকুমারকে আবার জিজ্ঞাসা করলে ঋষি বলেন—অবশ্যই আছে। তা হল চিত্ত। সঙ্কল্পের চেয়েও চিত্ত অবশ্যই বড়। চিত্ত বড় কেন? চিত্ত দিয়েই মানুষ অনুভব করে। সকলে আগে সচেতন হয়। তখন সে সঙ্কল্প করে। তারপর চিন্তা করে তারপর বাককে পরিচালিত করে। বাক্ মনের প্রেরণায় নাম উচ্চারণ করে।

নারদ, এসবই চিত্তে লীন হয়। চিত্তই তাদের উপাদান এবং চিত্তেই তাদের প্রতিষ্ঠা। বিদ্বান হোক, বুদ্ধিমান হোক আর নিরক্ষরই হোক, যার বিবেচনা বোধ থাকে সেই চিত্তবান, বুদ্ধিমান। যার তা নেই তাকে চিত্তবান বুদ্ধিমান বলা য'বে না। সবের মূলে চিত্ত। সে জন্যই নারদ তোমাকে চিত্তের সাধনাই করতে বলি। যে চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা

করে, যতদূর চিত্তের গতি হয়, সেও অনায়াসেই সে-ই স্থান পর্যন্তই যেতে পারে। সে-জন্যই নারদ, তুমি চিত্তেরই উপাসনা কর।

নারদ চিত্তব্রহ্ম সম্বন্ধে জানার পর ঋষিকে প্রশ্ন করেন—এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? ঋষি বলেন—হ্যাঁ আছে। নারদ বলেন—আমাকে অনুগ্রহ করে বলুন।

সনৎকুমার বলেন তা হল ধ্যান। চিত্তের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ধ্যান। পৃথিবী যেমন ধ্যানমগ্ন, তেমনি অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, জল, পর্বত, দেবতা, মানুষ সকলেই ধ্যানমগ্ন। সুতরাং এইলোকে মানবোচিত যাঁরা মহান হতে চান, তাঁরা অবশ্যই ধ্যানমগ্ন হবেন। কিন্তু যাঁরা নীচমনা, ঝগড়া-বিবাদ ভালবাসে, অপরের দোষ দেখে, সঙ্কীর্ণচেতা বা চাটুকার তারা কোনদিনই ধ্যানমগ্ন হতে পারেন না। ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে যে উপাসনা করে সে ধ্যানের গতি যতদূর, ততদূর নিশ্চিন্তে যেতে পারে। সুতরাং নারদ, তুমি ধ্যানেরই উপাসনা কর।

নারদ আবার ঋষির কাছে জানতে চাইলেন—ধ্যানের চেয়ে উত্তম আর কি কিছু নেই? ঋষি বললেন—হ্যাঁ আছে, তা হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের দ্বারাই লোকে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থবেদ—অথর্ববেদ, পঞ্চমবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, রাশিতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পাদি, ধনুর্বিদ্যা, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্বশাস্ত্র প্রভৃতি তত্ত্বের রহস্য তো অবশ্যই, এমনকি, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দেবতাগণ, মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ-পিপীলিকা-তৃণ-বনস্পতি সহ হিংস্র জন্তুগণ, পুণ্য-পাপ, সত্য-মিথ্যা, শুভ-অশুভ, মনোরম ও অমনোরম, অন্ন ও আস্বাদ, ইহলোক-পরলোক সবকিছুই বিজ্ঞানের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়।

নারদ তুমি বিজ্ঞানেরই উপাসনা কর। যে কেউ এই বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে বিজ্ঞানবান ও জ্ঞানবানদের সকল লোকই লাভ করে।

এরপর নারদ আবার জিজ্ঞাসা করেন—ভগবন্ বিজ্ঞানের চয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? ঋষি বলেন—আছে। বিজ্ঞানের থেকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বল। শতজন বিজ্ঞানবান্ লোকও একজন বলবানের ভয়ে কাঁপতে থাকে। কেউ যখন বলবান হয়, তখনই তার উন্নতি সম্ভব হয়। উন্নতির জন্য কাজ করে, গুরুসেবা করে, গুরুর কাছে থাকে—তাতে তার দ্রুত উন্নতি হয়। গুরুকে দেখা, গুরুর কথা শুনা, চিন্তা করা, বুঝা, কাজ করা সবই সে পারে। এই পৃথিবী তো বলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বলের দ্বারাই পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, পর্বত, দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ ও পিপীলিকা সকলেই প্রতিষ্ঠিত। তুমি এই বলকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর। যে এই বলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে বলের গতি যতদূর সেও ততদূর স্বচ্ছন্দেই যেতে পারে।

নারদ ঋষির কাছে জানতে চান—এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু আছে কি-না? ঋষি বলেন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে। সেটি হল অন্ন।

বলের চেয়েও অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হল অন্ন। কারণ, কেউ যদি দশ দিন না খেয়ে থাকে তাহলে সে বাঁচতে পারে না। বেঁচে থাকলেও কিন্তু সে চোখ, কান, মন, বুদ্ধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকতেও সে হবে দৃষ্টিহীন। শ্রবণহীন, মননহীন, বোধহীন, ক্রিয়াহীন এমন-কি বিজ্ঞানবিহীনও হবে। কিন্তু যখনই সে অন্নগ্রহণ করবে তখন সে দেখতে, শুনতে, বুঝতে, ভাবতে, কাজ করতে বা জানতে সমর্থ হবে। তাই নারদ তুমি অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। অন্নকে যে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে সে প্রচুর অন্নপানযুক্ত লোকসকল লাভ করে থাকে। এবং অন্নের গতি যত দূর, সেও স্বেচ্ছায় ততদূর যেতে পারে।

নারদ আবার ঋষির কাছে জিজ্ঞাসা করেন—অন্ন থেকেও শ্রেষ্ঠ কি? ঋষি বলেন তা হল জল। অন্নের চেয়ে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হল জল।

সেজন্য ভাল বর্ষা না হলে শস্য কম হবে এই আশঙ্কায় আমাদের

মনে কষ্ট হয়। দুঃখ হয়। আবার বর্ষা বেশী পরিমাণে হলে ফসলের আর অভাব হবে না মনে করে আমরা খুবই আনন্দিত হই। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, পর্বত, দেবতাবৃন্দ, মানুষ পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ, গাছপালা প্রভৃতি যা কিছুই দেখ-না কেন সবই জলের এক একটি বাস্তব রূপ।

তুমি জলকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। জলকে ব্রহ্মরূপে যে উপাসনা করে তার সব কামনাই পূর্ণ হয়। সে তার আকাঙ্ক্ষিত সব বস্তুই পায়। তৃপ্ত হয়। জলের গতি যতদূর, সেও ততদূর স্বচ্ছন্দে যেতে পারে।

নারদ আবার জিজ্ঞাসা করলেন—এর পর আর কিছু আছে কি-না? সনৎকুমার বলেন—নিশ্চয়ই আছে। নারদ বলেন, তাহলে অনুগ্রহ করে বলুন। ঋষি বলেন—তা হল তেজ। কারণ তেজ থেকেই জলের সৃষ্টি হয়। তেজ বাতাসকে আশ্রয় করে আকাশকে উত্তপ্ত করে তোলে। সেই গরম অসহ্য হয়ে উঠায় মানুষ বৃষ্টি চায়। ওই তেজ থেকেই আকাশ মেঘে ঢেকে যায়। তির্যক গতিতে মেঘের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ ছুটতে থাকে। মেঘ গর্জন করে। এভাবেই তেজ থেকে আসে জল। ওই মেঘ ডাকা, বিদ্যুৎ চমকানো ও বৃষ্টির আশায় সবারই মন খুশিতে ভরে ওঠে।

নারদ তুমি তেজকে উপাসনা কর। তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলে তোমার কাছে অন্ধকার আসতে পারবে না। পরন্তু তেজের যতদূর গতি ততদূরই যেতে সক্ষম হবে।

নারদ এবার ভাবেন তেজই কি সবার শ্রেষ্ঠ, না আরও কিছু আছে? তাই ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ঋষি বলেন—নিশ্চয়ই আছে। তা হল—আকাশ। তেজের চেয়েও অবশ্যই আকাশ শ্রেষ্ঠ। মানুষ একজন যে অন্যের সঙ্গে কথা বলে, মানুষ যে একজন আরেকজনকে ডাকে, তার ডাক শুনে উত্তর দেয় সবই করে আকাশেরই সাহায্যে।

মানুষের আনন্দ, দুঃখ সবই আকাশে। যা কিছু জন্মায় সবই আকাশমুখী।

নারদ, তুমি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। ব্রহ্মরূপে আকাশকে উপাসনা করলে আকাশের মতই সীমাহীন হওয়া যায় ও জ্যোতির্ময় লোকসকল পাওয়া যায়। আকাশের যতদূর গতি ততদূরই স্বেচ্ছায় যেতে পারা যায়।

নারদ আবার জিজ্ঞাসা করেন—তাহলে আকাশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কি আছে? ঋষি বলেন, আকাশের চেয়ে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হল স্মৃতি। স্মৃতি যদি না থাকে তবে, বহু লোকের সমাবেশ হলেও তারা কেউ কারও কথা শুনতে পায় না, বলতে পারে না, চিন্তাও সম্ভব হয় না। আর যদি স্মৃতি ঠিক থাকে, তাহলে মানুষ সব শুনতে পায়, চিন্তা করতে পারে, জানতে পারে। স্মৃতির সাহায্যেই লোকে পুত্র ও পশুকে চিনতে পারে। তাই নারদ তুমি স্মৃতিকেই উপাসনা কর। এই স্মৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা যে করে সে স্মৃতির পথ যতদূর বিস্তৃত, ততদূর স্বেচ্ছাগতি লাভ করে।

নারদ ভাবেন স্মৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ আরও কিছু আছে কি-না? তাই তিনি সেকথা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করায় ঋষি বলেন অবশ্যই আছে। তা হল—আশা। আশায় উদ্দীপ্ত হয়েই স্মৃতিধর লোকেরা মন্ত্রপাঠ, দৈনন্দিন কাজকর্ম সবই করে। আশাই স্মৃতিকে জাগ্রত করে পুত্র, পশু, ইহলোক, পরলোক যা-কিছু সবেরই মূলে আশা।

নারদ তুমি এই আশার উপাসনা কর। যে আশাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে তার কোন কামনা-বাসনা অপূর্ণ থাকে না এবং আশার যতদূর গতি সে ততদূর গতিলাভ করে।

নারদ ভাবছেন আশার চেয়ে কি আর বড় কিছু নেই? তিনি সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন। ঋষি বলেন নিশ্চয়ই আছে। তা-হল—প্রাণ। আশার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে প্রাণ। একটা নির্দিষ্ট নাভি থেকে

শলাকাগুলি বের হয়ে যেমন একটা চাকাকে ধরে রাখে, তেমনি এই দেহরূপী চাকাকেও ধরে রেখেছে প্রাণ। প্রাণ কারোর উপর নির্ভর করে না। সে নিজের কাজ নিজেই করে। প্রাণই প্রাণ দান করে এবং প্রাণকে দান করে। প্রাণই বাবা, মা, ভাই, বোন, আচার্য, ব্রাহ্মণ সবই। কেউ যদি ওই সকল লোকেদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তাদের প্রাণে কষ্ট দেয়, তাহলে তাদেরকে হত্যার সমান দোষ হয়। সেজন্য লোকে ওই আঘাতকারীকে তুমি পিতৃঘাতী, মাতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী, ভগিনীঘাতী ইত্যাদি বলে। কিন্তু আবার যখন ওই প্রাণই ওই সমস্ত মানুষদের ছেড়ে চলে যায় তখন তাদের শত আঘাত করলেও, খণ্ড খণ্ড করে পোড়ানো হলেও তার জন্য কেউ কাউকে দোষী মনে করে না। দোষ দেয় না। পিতৃঘাতী, মাতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী, গুরুঘ্ন প্রভৃতি অপবাদও দেয় না।

নারদ, তুমি যা কিছু দেখছ, এ সমস্তই প্রাণ। এই বোধ যার মধ্যে আসে সে তখন তাদের স্বরূপ প্রাণকেই দেখে। প্রাণকেই মনে করে। প্রাণকেই জানে। তখন তাকে লোকে অতিবাদী বা বহুবক্তা বলে মনে করে। ঋষি বলেন অতিবাদী মানে অহেতুক বহুবক্তার কথা বলছি না। অতিবাদী হলেন তিনিই যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বের বক্তা। প্রাণের এই তত্ত্বকে জেনে কিছু বলায় যদি কেউ তোমাকে কিছু বলে তবে তুমি কোন বাদ, প্রতিবাদ না করে বা অস্বীকার না করে বলবে—হ্যাঁ আমি অতিবাদী।

সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত নারদের মনকে এত তত্ত্বকথা নাড়া দিতে না পারলেও প্রাণের কথা শোনার পর তাঁর মন তোলপাড় শুরু করে দেয়। ঋষি বলেন—নারদ, যখন কেউ মনন করেন, তখন তিনি বিজ্ঞান লাভ করেন, মনন না করে কেউ বিজ্ঞান লাভ করতে পারে না।

এরপর নারদের আগ্রহ দেখে সনৎকুমার তাঁকে সত্য, বিজ্ঞান, মনন, শ্রদ্ধা,নিষ্ঠা ও একাগ্রতা বিষয়ে বলার পর ভূমা বিষয়ে বলছেন—নারদ, যার নাম ভূমা তারই নাম সুখ। অল্পে সুখ নেই। ভূমাকেই

বিশেষভাবে জানতে আগ্রহী হতে হবে। তবেই সেই সত্যস্বরূপকে জেনে শোক-তাপের পরপারে যাওয়া যাবে।

নারদ ভূমাকে জানতে আগ্রহী হলে সনৎকুমার বলতে থাকেন—ভূমা হল তাই যাতে অন্য কিছু দেখার থাকে না, শোনার থাকে না, জানার থাকে না। আর যাতে অন্য কিছু দেখার থাকে, শোনার থ'কে, জানার থাকে তাই হল অল্প। যিনি ভূমা তিনি অমৃত বা অমর অক্ষয়, আর যা অল্প তা মর বা মরণশীল, ক্ষয়শীল। নারদ প্রশ্ন করেন—হে ভগবন্, এই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত— স্বমহিমায় অথবা মহিমাতেও নন?

তাঁর কথা শুনে সনৎকুমার বলেন—এই লোকে গো, অশ্ব, হস্তী, স্বর্ণ, স্ত্রী, ভূমি, গৃহ প্রভৃতিকেই মহিমা বলে। আমি এরকম মহিমার কথা বলছি না। কারণ প্রতিষ্ঠা তাকেই বলে যার দ্বারা একজনের আরেকজনের উপর অবস্থিতি বুঝায়।

ঋষি আরও বলেন— ভূমা সর্বত্রই বিরাজ করছেন। তিনি যেমন বিশ্বজগতে, তেমনি দেহ জগতেও বর্তমান। তিনি নীচে, ওপরে, সামনে, পিছনে, উত্তরে, দক্ষিণে, সবদিকেই রয়েছেন। আবার অহং অর্থাৎ আমি দৃষ্টিতে যদি দেখা যায় তবে দেখা যাবে—আমি নীচে, ওপরে, সামনে, পিছনে, দক্ষিণে, উত্তরে। আমিই সব। আবার যদি আত্মদৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তবে দেখা যাবে—আত্মা নীচে, ওপরে, সামনে, পিছনে, দক্ষিণে, উত্তরে। আত্মা এই সমস্ত কিছুই হয়ে আছেন। নারদ, এভাবে দেখে, মনন করে, এরকম বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মরতি, আত্মক্রীড়া, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দে বিভোর হন। তিনি তখন আপনার মাঝে আপনি ডুবে থেকেও সমস্ত লোকে অপ্রতিহত গতিতে ঘোরাফেরা করেন। পরন্তু যারা এরকম নিজেকে স্বরাট মনে না করে নিজেকে অন্যের অধীনে মনে করে তারা পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। সেই ক্ষয়শীল মৃত্যুলোকের পরপারে অমর্ত্যলোকে

কখনো যেতে সক্ষম হয় না। এরকম দর্শনকারী, মননকারী, বিজ্ঞানশীল, বিদ্বানের পক্ষে আত্মা থেকে প্রাণ, আত্মা থেকে আশা, আত্মা থেকে স্মৃতি, আত্মা থেকে আকাশ, আত্মা থেকে তেজ, আত্মা হতে জল, আত্মা থেকে অবির্ভাব এবং তিরোভাব,আত্মা থেকে অন্ন,আত্মা থেকে বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সঙ্কল্প, মন, বাক্, নাম, মন্ত্রসকল কর্ম সব কিছুই হ্য়ে থাকে। যাদের কথা তোমায় শোনালাম এ সবই তিনি হয়েছেন, হয়ে আছেন। সারা জগতে চলছে সেই আত্মারই লীলা।

উপনিষদের এই গল্প প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্বামী প্রণবানন্দজীর সেই গুরুত্বপূর্ণ বাণীটি যেখানে তিনি বলেছেন—

ধর্মের প্রাণ অনুভূতি, অনুষ্ঠান ও আচরণে। শাস্ত্র পড়িয়া বা লোকমুখে শাস্ত্রকথা শুনিয়া কেহ কখনো ধর্মলাভ করিতে পারে না।

এখানে দেবর্ষি নারদ সবরকম বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্ববিদ্যা, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি সবকিছুতেই পণ্ডিত হলেও তিনি অশান্তি ও শোক-তাপের অতীত হতে পারেননি। কারণ তাঁর অনুভূতি হয়নি। আত্মজ্ঞান লাভ হয়নি। তিনি নিজেই বলছেন—এত পড়াশুনা করে আমি মন্ত্রবিৎই হয়ে আছি, আত্মবিৎ হতে পারিনি। তাই স্বামী প্রণবানন্দজী উপনিষদ-নির্দেশিত ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষিত মানুষকে সঙ্কল্প নেওয়ার জন্য বললেন—**আত্মতত্ত্বোপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত এই ত্যাগীর বেশ পরিত্যাগ ও সন্ন্যাস আশ্রমের কোন বিধি-নিষেধ কদাপি লঙ্ঘন করিবে না।**

ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে

ঋষি দুর্বাসা ও গোপিগণ

ঋষি দুর্বাসার নাম অনেকেই জানেন। তিনি ছিলেন খুবই ক্রোধী। একবার তাঁর কোন ভাবে রাগ হলে আর রক্ষে নেই। তিনি অভিশাপ দিয়ে কঠোর শাস্তি দিতেন। সেজন্য সকলেই তাঁকে ভয় করতেন। এমন-কি তাঁর কাছে যাতে কোন দোষ-ত্রুটি না হয়—সেজন্যও সকলেই সব সময় সতর্ক থাকতেন। রাজা দুর্যোধন কি-ভাবে তাঁর সেবা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করে পঞ্চপাণ্ডবেরা যাতে মুনির অভিশাপে ভস্মীভূত হয়ে যায় সেই চক্রান্তই করেছিলেন—একথা আমরা মহাভারতে পড়েছি। আমরা জেনেছি—সেদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সহায় না থাকলে তাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল।

কিন্তু ঋষি দুর্বাসা যেমন ছিলেন খুব রাগী, তেমনি ছিলেন কঠোর তপস্বী এবং ব্রহ্মজ্ঞানীও।

এই ঋষি দুর্বাসাকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য একদিন ব্রজগোপীরা গিয়েছিলেন তাঁর কাছে। তাঁরা ডালা-ভর্তি চিঁড়া, মুড়ি, খই ; হাঁড়ি-ভর্তি দই, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ঋষির আশ্রমে। গোপীরা দুর্বাসাকে প্রণাম করে জিনিষপত্রগুলি রেখে শ্রদ্ধার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুনিবর তাই দেখে ও তাঁদের মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে যমুনা নদীতে স্নান করে এলেন। তারপর ওই সমস্ত খাবারগুলি পরিতৃপ্তি সহকারে খেলেন। খাওয়া শেষে ব্রজগোপীদের খুব আশীর্বাদ করে বললেন—যাও, এখন তোমরা বাড়ী ফিরে যাও।

ঋষি তাঁদের যেতে বলেছেন। কিন্তু তাঁরা যাবেন কি ভাবে? কারণ যমুনা যে কল্ কল্ রবে দুকূল প্লাবিত করে বয়ে চলেছে। সেই ভরা যমুনা তাঁরা পার হবেন কি উপায়ে। তাই তাঁরা দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ফিরে যাবার আদেশ তো দিলেন, কিন্তু মুনিবর, আমরা এখন এই ভরা যমুনা পার হয়ে যাব কি ভাবে?

দুর্বাসা সঙ্গে সঙ্গে বললেন—যমুনাকে গিয়ে বল, দুর্বাসা উপবাসী একথা শুনলে যমুনা নিশ্চয়ই তোমাদের যাবার পথ করে দেবে।

ঋষির এমন কথা শুনে ব্রজগোপীদের তো নিশ্চয়, সবারই বিস্ময়ে হতবাক্ হওয়ারই কথা। তাই তাঁরা ঋষির কথা শুনে একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। ভাবটা যেন এরকমই যে—যে ঋষি আমাদের বাড়ী থেকে বয়ে আনা চিঁড়া, মুড়ি, খই, ক্ষীর, মাখন, ছানা, দই ইত্যাদি পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে পাত্র শূন্য করে দিলেন, আর তিনি কি-না বলেন 'দুর্বাসা অভুক্ত'। এত খেয়েও তিনি অভুক্ত হলেন কি ভাবে? ব্রজগোপীরা যেন ঋষির কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছেন না, আবার ভয়ে কিছু বলতেও পারছেন না—যদি ঋষি রেগে যান, তাই তাঁরা নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়েই রয়েছেন।

ত্রিকালদর্শী ঋষি দুর্বাসা। তিনি ব্রজগোপীদের মনের ভাব বুঝতে পারলেন। তাই তিনি বলতে থাকলেন—

এই যে আকাশ তা অনন্ত অসীম। আকাশ শব্দগুণযুক্ত। কিন্তু আকাশ এবং শব্দ দুটি বস্তুই আলাদা আলাদা। আত্মা সর্বত্র বিরাজ করেন। আকাশের সঙ্গে আত্মা নিশ্চয়ই জড়িয়ে আছেন। কিন্তু আকাশ তা জানে না। ওই যে বিশ্বব্যাপী বা আকাশ জুড়ে থাকা আত্মা—সেই আত্মাই আমি। তাহলে, তোমাদের ভোজনদ্রব্য আমি খেলাম কিভাবে?

আবার দেখ, বায়ু হল স্পর্শগুণযুক্ত। বায়ু সর্বত্রই বিরাজ করে। তাকে আমরা শ্বাসে-প্রশ্বাসে অনুভব করি। পরমাত্মাও সর্বত্র বিরাজিত। তিনিও অবশ্যই বায়ুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িয়ে আছেন। কিন্তু এই বায়ু তাঁর স্বরূপ জানে না। আমিই সেই সর্বব্যাপী আত্মা। তাহলে, আমি কেমন করে ভোক্তা হলাম?

তেজ হল রূপবিশিষ্ট। সর্বত্র বিরাজমান আত্মা তেজ ও রূপ থেকে আলাদা হয়েও অগ্নিতে অবস্থান করছেন। কিন্তু অগ্নি তা জানতে

পারে না। সেই আত্মাই আমি। তাহলে, আমি কি-ভাবে ভোক্তা হলাম?

জল রসযুক্ত। জল এবং রসের মধ্যে থেকেও আত্মা জল ও রস থেকে আলাদা। জল তাঁকে জানতে পারে না। আমি সেই আত্মা তাহলে আমি কোন্ যুক্তিতে ভোক্তা হলাম?

পৃথিবী গন্ধগুণযুক্তা। আত্মা সর্ব্বব্যাপী। এমন-কি পৃথিবীতেও তিনি ব্যাপ্ত। কিন্তু সেই আত্মা পৃথিবীর মধ্যে থাকলেও পৃথিবী তাঁকে জানতে পারে না। আমিই সেই আত্মা। সুতরাং, আমি ভোক্তা হলাম কিভাবে?

এই যে আমাদের মন সে কত কিছুই তো চিন্তা করতে পারে। কত কিছুই গ্রহণ করতেও পারে। অর্থাৎ, বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির মত আকাশ প্রভৃতির চিন্তাও সে করতে পারে। তাদের গ্রহণ করতেও সে সক্ষম। কিন্তু সেই মন যখন ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়ে পড়ে অর্থাৎ সুপ্ত বা মুক্ত অবস্থায় যখন যে-কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির চিন্তা সে করতে পারে না, সর্বত্রই অভেদ দেখে সেই যে আত্মা, তাই আমি। অতএব, আমি ভোক্তা হলাম কেমন করে।

মায়ামুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি নিজেকে সবসময় নিষ্ক্রিয় ও শুদ্ধ চৈতন্য বলেই মনে করেন। যা-কিছু কাজ-কর্ম তাঁর দ্বারা হয়—সে সবই তাঁর শরীর, মন প্রকৃতির নিয়মে করলেও তা তিনি করেন না। কারণ তিনি দেহ-মন প্রভৃতি থেকে সবসময় নিজেকে পৃথক্ বোধ করেন।

ঋষি যেন আরও বলতে চেয়েছেন—আমি শিব, আমি জীব নই। যদিও জীবকে আশ্রয় করেই শিব। কিন্তু জীব থেকে শিব পৃথক। সুতরাং ব্রজগোপীদের দেওয়া খাদ্যগুলি খেয়েছে দেহ, খেয়েছে জীব। কিন্তু আমি আত্মা বা আমি শিব সেই খাদ্যগুলি খাইনি। তাই আমি অভুক্ত।

এ অবস্থা সাধারণের নয়—ব্রহ্মজ্ঞানীর। এই অবস্থায় প্রতিটি মানুষকেই পৌঁছুতে হবে। অন্যথায় পুনরায় জন্ম, পুনরায় মৃত্যু থেকে

কারও রেহাই নেই। তাই জীবের একান্ত কল্যাণকামী যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী জীবকে সেই পরম প্রাপ্তির উপায় দেখিয়ে দিয়ে উপনিষদের নির্দেশিত সাধনপথ গ্রহণের উপযোগী করতে চেয়ে বলছেন—

এই মহা সংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়ী হইতে হইলে তোমার একমাত্র সম্বল হইবে বিবেক বৈরাগ্যরূপ মহাস্ত্র, তোমার একমাত্র সহায় ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য—এই মহামন্ত্র। সঙ্কল্পে দৃঢ় হওয়া, কর্তব্যে অবিচলিত থাকাই হইবে—তোমার মূলনীতি। রিপু-দমন ও ইন্দ্রিয়-সংযমই হইবে তোমার জীবনের মহাব্রত। চরম সত্যকে উপলব্ধির জন্য জীবনকে উৎসর্গ করিতে দ্বিধা বোধ না করাই হইবে তোমার সঙ্কল্প।

তৎ - ত্বম্ - অসি

চার বেদে চারটি মহাবাক্য আছে। সেগুলি হল—অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, সোঽহং ও তত্ত্বমসি। অর্থাৎ এই আত্মাই ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম, আমিই সেই ও তুমি হচ্ছ সেই পরমাত্মা।

এর মধ্যে এই 'তত্ত্বমসি' সম্পর্কে ঋষি উদ্দালক আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলছেন—যিনি অণুর চেয়েও অণু, যিনি সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতম, সেই তিনিই এই বিশ্ব-জগতে নানা রূপ ধরে আছেন। এ সবই তাঁরই বিকাশ, তাঁরই প্রকাশ। তিনি সত্য-সৎস্বরূপ। তিনি হচ্ছেন আত্মা। ত্বৎ-ত্বম্-অসি—তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু যেন কথাটা ঠিক মত বুঝতে পারলেন না। তাই তিনি পিতাকে আবার উপদেশ দিতে বললে ঋষি বলেন—

হে সৌম্য, মৌমাছিরা যখন মধু সংগ্রহ করে তখন তারা নানা রকমের গাছের ফুল থেকে মধু এনে এনে মৌচাকে সংগ্রহ করে। সেই মধু যখন চাক থেকে কেউ ভেঙ্গে নিয়ে আসে তখন যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—এটা কোন ফুলের মধু, কোন গাছের মধু? তাহলে তা কি বলা সম্ভব? সম্ভব নয়। সুতরাং সে বলবে এটা কোন গাছের, কোন ফুলের মধু তা তো বলা সম্ভব নয়। তবে এটা যে মধু তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তেমনি প্রাণী যখন ঘুরতে ঘুরতে একসময় গভীর ঘুমে ডুবে যায়, অর্থাৎ সুষুপ্তিতে মগ্ন থাকে তখন বুঝতেই পারে না যে সে সৎস্বরূপের সঙ্গে এক হয়েছিল। তাই ঘুম ভেঙ্গে যেতেই তার বিচার শুরু হয়ে যায় কে বাঘ, কে সিংহ, কে শূকর, কে কীট-পতঙ্গ, কে দংশক-মশক ইত্যাদি। কারণ তখন তারা তাদের সুষুপ্তির সময়ের যে আসল পরিচয় সেটা ভুলে গেছে। সেই যে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম বস্তু এই হ'ল সেই সৎ বস্তু। তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু 'ত্বৎ-ত্বম-অসি'—তুমি সেই সৎ।

শ্বেতকেতু ব্যাপারটা আরো ভালভাবে বুঝতে চাইলে আরুণি

বলেন—নদী ও সমুদ্র দেখেছ। সমুদ্র থেকেই সৃষ্টি হয় নদীর। আবার নদী গিয়ে মিশে সেই সমুদ্রেই। পূর্ববাহিনী নদীগুলি পূর্বদিকে যাচ্ছে আর পশ্চিমবাহিনী নদীগুলি পশ্চিম দিকে বয়ে চলেছে। কিন্তু যে যেদিক দিয়েই প্রবাহিত হোক সেই এক সমুদ্রেই গিয়ে সকলে লীন হচ্ছে, সব এক হয়ে যাচ্ছে। নদী সমুদ্রে মিশে যাওয়ার পর সেই জলের কোনটা সমুদ্রের আর কোনটা নদীর জল তা যেমন বলা যাবে না, তেমনি বলা যাবে না কোনটা কোন নদীর জল সে কথাও। সেরকমই এই জগতের সকল জীবগণ এসেছে সেই সৎ থেকে। আবার তারা মৃত্যুর পর গিয়ে মিশবেও সেই সৎ-তেই। কিন্তু যতদিন তারা বেঁচে থাকে ততদিনই তারা পৃথক্ পৃথক্ বা বাঘ, সিংহ, শূকর, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির মত সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠে যে যা ছিল তাই নিয়েই বিচার করে। তাদের যে সৃষ্টি কোথা থেকে এবং কোথায় গিয়ে পুনরায় মিলতে হবে তা তারা ভুলেই যায়।

তাই পুত্র! সেই যে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম বস্তু এই হল সেই তিনিই পরমার্থ সত্য। শ্বেতকেতু, তৎ-ত্বম্-অসি—তুমি সেই সৎ।

শ্বেতকেতু বিষয়টিকে আরও সহজভাবে বুঝতে চাইলে ঋষি বলেন—

ওই যে তোমার সামনে খুব বড় গাছটাকে দেখতে পাচ্ছ, যদি গাছটার গায়ে কেউ কুঠার দিয়ে কোপ মারে তাতে গাছটার গা থেকে রস বের হবে। গাছটার অন্য যে কোন জায়গায় কোপ মারলেও একই অবস্থা হবে। কিন্তু গাছটা মরবে না। পরন্তু গাছটা যেমন ছিল তেমনভাবেই বেঁচে থাকবে। কেন-না গাছের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে যে আত্মা আছেন—তিনি অক্ষত। কেউ গাছটার একটা ডাল কেটে ফেলে, সে ডালটা শুকিয়ে যাবে। তারপর আবার একটা ডাল কাটলে সেটাও শুকিয়ে যাবে। এভাবে যদি গোটা গাছটারই গোড়ায় কেটে দেওয়া হয় তবে পুরো গাছটাই শুকিয়ে যাবে।

কিন্তু গাছটি শুকিয়ে গেলেও আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা যখন জীবদেহ ছেড়ে চলে যায়, তখন দেহটাই মারা যায়। আত্মা মারা যায় না। সেই যে সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতম বস্তু—তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনিই আত্মা। শ্বেতকেতু, ত্বৎ-ত্বম্-অসি—তুমিই সেই সৎ। তুমিই সেই আত্মা।

বিষয়টি জটিল, তাই শ্বেতকেতু আরও ভালভাবে তা বুঝতে চাইলেন।

ঋষি বলতে শুরু করলেন। তাঁদের সামনেই থাকা বিরাট বটগাছ থেকে একটি ফল তুলে আনার জন্য আরুণি শ্বেতকেতুকে বললেন। শ্বেতকেতু ফলটি তুলে আনলে ঋষি বলেন ওটিকে টুকরো কর। শ্বেতকেতু টুকরো করলে আরুণি জিজ্ঞাসা করেন—ওতে কি দেখছ? শ্বেতকেতু বলেন, কতকগুলি অতি ছোট ছোট অণুর মত বীজ। আরুণি এবার বলেন ওই বীজগুলোর মধ্য থেকে একটাকে নিয়ে ভাঙ্গ। শ্বেতকেতুও তা ভাঙ্গেন। এবার ঋষি জিজ্ঞাসা করেন ওতে কি দেখছ। তিনি বলেন—কিছুই দেখছি না।

আরুণি বলেন—না, ওই বীজের মধ্যে যে সূক্ষ্মতম অংশটি চোখে দেখতে পাচ্ছ না এই যে বিরাট বটগাছটা হয়েছে ওটা কিন্তু তা থেকেই।

শ্বেতকেতু বিষয়টিকে আরও সহজ করে বুঝতে চাইলে ঋষি এবার বলেন—

এক গ্লাস জলে কিছুটা নুন দিয়ে রাখতে বললেন। শ্বেতকেতু তাই করলেন। পরদিন তিনি আরুণির কাছে গেলে তিনি বলেন, কাল রাত্রে জলের মধ্যে যে নুনটা দিয়ে রাখতে বলেছিলাম সেই নুনটা এখন নিয়ে এস। শ্বেতকেতু ঋষির কথামত নুনটা খুঁজে আনতে গিয়ে নুন খুঁজেই পেলেন না। কারণ সেটা তো গলে জলের সঙ্গে মিশে গেছে। সুতরাং ফিরে পাওয়ার কোন উপায় নেই। তাই নুন না নিয়েই ফিরে এলেন তিনি। ঋষি বলেন—নুন পেলে না-তো! আচ্ছা ওই গ্লাসের ওপর থেকে একটু জল পান কর। তিনিও তাই করলেন।

ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন—কি? কেমন লাগল? শ্বেতকেতু বলেন, নোনতা।

আরুণি বলেন—তাহলে এবার গ্লাসের মাঝখান থেকে একটু জলপান কর।

তিনি তাই করে এলে ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন লাগল? শ্বেতকেতু বলেন—নোনতা।

ঋষি বলেন—এবার তাহলে গ্লাসের নীচ থেকে একটু জলপান করে এস। তিনি তাই করে এলে ঋষি জিজ্ঞাসা করেন, এবার কেমন লাগল? শ্বেতকেতু বলেন, নোনতা।

এরপর আরুণি বলেন—দেখ, গ্লাসের জলটা আগে কি নোনতা ছিল? ছিল না। কিন্তু পরে নোনতা হয়ে গেল। কারণ, ওই জলের সঙ্গে নুন মিশিয়েছিলে। আর নুনটা জলে মিশে যাওয়ার জন্যই তুমি নুনটাকে খুঁজে পাওনি। পুরো জলের সঙ্গেই নুনটা মিশে জলকেই নোনতা করে ফেলছে। সেজন্য নুনটাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না। তাই বলে তুমি বলতে পার না যে, নুনটা নেই। সেরকম আমাদের এই শরীরের সেই সৎ-স্বরূপ আত্মা সূক্ষ্মরূপে সব সময়ই আছেন। তুমি তাঁকে শুধু দেখতে পাচ্ছ না। এই যে সূক্ষ্মরূপে যিনি বর্তমান তিনিই আত্মা। তিনি সত্য, তিনিই নিত্য। শ্বেতকেতু তৎ-ত্বম্-অসি—তিনিই পরমার্থ সত্য, তুমিই সেই সৎ।

এরপরও আরুণি শ্বেতকেতুকে বোঝানোর জন্য বলতে থাকেন—গান্ধার দেশ থেকে কোন একটি লোকের চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে দূরে এক নির্জন জায়গায় ছেড়ে দেয়। লোকটির তখন বাড়ী ফেরার আগ্রহ খুবই। কিন্তু চোখ বাঁধা থাকায় সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তাই কোন দিকে, কিভাবে যাবে তাও ঠিক করতে পারছে না। শুধু এখানে সেখানে ঘুরছে। তখন হয়তো সে চিৎকার করে লোক ডেকে নিজের অবস্থার কথা বলে বাঁধন খুলে দেওয়ার জন্য বলে। তারপর বাঁধন খুলে দিলে লোকটি নানা লোককে জিজ্ঞাসা করতে

করতে এক সময় এসে ঠিক নিজ বাড়ী গান্ধারে এসে পৌঁছে যায়। সেরকম যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চান, তাঁরা গুরুর উপদেশ মত চলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দেহবোধ না যায়, অর্থাৎ দেহ থেকে তিনি মুক্ত না হন ততক্ষণ তিনি ব্রহ্মে লীন হতে পারেন না। বা ব্রহ্মলাভ হয় না। অর্থাৎ তাঁর ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে না। দেহবোধ গেলেই তিনি গান্ধারবাসীর মতো নিজের দেশে চলে যান।

শ্বেতকেতু ত্বৎ-ত্বম্-অসি—তুমিই সেই সৎ। তুমিই সেই আত্মা।

বিষয়টি কঠিন হলেও শ্বেতকেতু তা বুঝতে পারছেন, তাই মনে আনন্দ হচ্ছে। এবং তিনি ঋষির কাছে আরও শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঋষি বলতে থাকেন—

একটি লোক খুবই জটিল রোগে আক্রান্ত। তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সেই সময় তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুজন সবাই তাকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করছে—আমাকে চিনতে পারলে? যতক্ষণ পর্যন্ত ওই লোকটির বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরম দেবতায় বিলীন না হচ্ছে ততক্ষণই সে সকলকে চিনতে পারছে। কিন্তু যখনই বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরম দেবতায় লীন হয়ে গেল, তখন সে হয়ে গেল নিষ্প্রাণ। তখন আর সে কাউকেই চিনতে পারে না।

এই যে সূক্ষ্মস্বরূপ আত্মা—তিনিই সারা জগতের আত্মা। তিনিই সৎ-স্বরূপ সত্য। শ্বেতকেতু, ত্বৎ-ত্বম্-অসি—তিনিই পরমার্থ সত্য। তুমিই সেই।

শ্বেতকেতুর শোনার আগ্রহ আরও বেড়ে উঠলে। ঋষিও বলতে থাকেন—

একটি লোককে চোর বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সুতরাং তাকে পরীক্ষা করার জন্য আগুনে কুডুল গরম করতে বলা হল। রাজকর্মচারীরা যাকে চোর বলে সন্দেহ করে এনেছে, সে চুরি করেও অস্বীকার করতেই পাবে। আর সে চুরি করে অস্বীকার করার জন্য বা মিথ্যা বলার জন্য ওই শাস্তিই পাবে। এবং লোহার গরম কুডুল তার

ক্ষতি করবে। কিন্তু যদি সে সত্যই চুরি না করে, তাহলে সে সত্য কথাই বলবে। এবং সে সত্যকে আশ্রয় করে থাকার জন্য লোহার গরম কুড়ুলও তার কোন ক্ষতি করবে না। তখন সে স্বভাবতই দোষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

এই যে লোকটি যেমন সত্যকে আশ্রয় করে থাকার জন্য তাকে লোহার গরম কুড়ুলে কিছুই ক্ষতি করতে পারল না, সত্যই তাকে রক্ষা করল। তেমনি লোকে এই সত্য বলেই আত্মবান্ হয়। জগতের এই সমস্তই সেই সত্য, তিনিই আত্মা। তিনিই সেই ত্বৎ-ত্বম-অসি। তুমিই সেই।

এভাবেই ব্রহ্মজ্ঞ পিতা উদ্দালক আরুণির কৃপায় শ্বেতকেতু জেনেছিলেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সেই সৎ-স্বরূপকে। আর মন-প্রাণ ভরে তাঁকে উপলব্ধি করে ধন্য হয়েছিলেন। ধন্য হয়েছিলেন তিনিই যে সেই ত্বৎ-ত্বম্-অসি তা অনুভব করে। এতকাল বেদ মুখস্থ করেও তিনি পাননি।

উপনিষদের এই দৃষ্টান্তের সার কথাই যেন স্বামী প্রণবানন্দজীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত। তিনি বলছেন—

আত্মানুভূতি ও আত্মদর্শন—এই অবস্থা মানুষ চায়। কিন্তু এই আত্মানুভূতি ও আত্মদর্শন কেবলমাত্র গুরুর কৃপায় ও গুরুর প্রসাদেই লাভ হয়ে থাকে। তাই বীর সন্ন্যাসী একমাত্র গুরুর আদেশ-উপদেশকেই জীবনের প্রধান সাধনা ও তপস্যা বলিয়া ধরিয়া থাকে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে

প্রাণের খেলা

ভরদ্বাজের পুত্র ছিলেন সুকেশা। শিবির পুত্র ছিলেন সত্যকাম। গর্গের পুত্র ছিলেন সৌর্যায়ণী। অশ্বলের পুত্র ছিলেন কৌসল্য, বিদর্ভ দেশের ভৃগুপুত্র হলেন ভার্গব এবং কত্যপুত্র ছিলেন কাত্যায়ন কবন্ধী। এঁরা সকলেই ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। সকলেই জ্ঞানী-গুণী। কিন্তু জ্ঞান-সাগর যে অনন্ত—অফুরন্ত। তার তো আর শেষ নেই। সুতরাং যাঁরা জ্ঞানের অন্বেষণ করেন তাঁদের জ্ঞানের পিপাসা মেটাও খুবই কঠিন। পরন্তু তাঁরা চান পরম জ্ঞানী হতে। মনের সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই উপযুক্ত আচার্যের সন্ধানে ছয় মুনির পুত্র মিলে বেরিয়ে পড়েছেন। তপোবনে তপোবনে খুঁজছেন তেমন মহাজ্ঞানী, মহাঋষি যাঁর কাছে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যাবে। যিনি তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ সমাধান করতে পারবেন।

সেই চিন্তা নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা একদিন ঈশ্বরের করুণায় পেয়ে গেলেন ঋষি পিপ্পলাদকে। তাঁর মুখমণ্ডলে দিব্যজ্যোতি—যেন সেখান থেকে মহাজ্ঞানের শুদ্ধ আলোক বিকিরিত হচ্ছে। ছয় ঋষিপুত্রই মুনিবরকে দেখে বুঝলেন, ইনিই তাঁদের সব প্রশ্নের সমাধান করতে পারবেন। তাঁদের জ্ঞানের পিপাসা ইনি দূর করতে সমর্থ, সমর্থ ব্রহ্মেরও সন্ধান দিতে। যাঁকে তারা খুঁজছিলেন ইনিই হয়তো সেই মহাজ্ঞানী মহাজন।

যথানিয়মে ছয়জনই সমিধ হাতে ঋষির কাছে গিয়ে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করে নিজেদের অন্তরের বাসনা ব্যক্ত করে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন।

সত্যদর্শী ঋষি পিপ্পলাদ। তিনি ছয় মুনিপুত্রেরই সর্বাঙ্গ দেখলেন। দেখেই বুঝলেন এরা যা চায় তা অবশ্যই পাওয়ার যোগ্য। তবুও বললেন—তোমরা এখানে এক বছর শ্রদ্ধার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযম, ব্রহ্মচর্য ও আস্তিক্যবুদ্ধি নিয়ে থাক। তারপর তোমাদের যা যা জিজ্ঞাস্য

আছে তা জিজ্ঞাসা করো। যদি আমার জানা থাকে তবে অবশ্যই বলব।

ঋষিপুত্ররা মহামুনি পিপ্পলাদের নির্দেশ মত এক বছর তাঁর আশ্রমে থেকে ইন্দ্রিয়-সংযম, ব্রহ্মচর্য ও আস্তিক্যবুদ্ধি নিয়ে চলতে থাকলেন। বছর শেষ হলে মুনিবর দেখলেন তাঁদের আচার-আচরণ সন্তোষজনক। বৎসরান্তে ঋষিপুত্ররাও পিপ্পলাদকে তাঁদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শুরু করলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন কত্যপুত্র কাত্যায়ন কবন্ধী। তাঁর জিজ্ঞাসা শেষ হলে বিদর্ভ দেশের ভৃগুপুত্র ভার্গব জিজ্ঞাসা করছেন—ভগবন্, কতজন দেবতা (ইন্দ্রিয়শক্তি) প্রাণী শরীরকে বিশেষভাবে ধারণ করেন? জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ভেদে বিভক্ত দেবতাদের কারা নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করে এই শরীরকে প্রকাশিত করেন? এদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তরে ঋষি বলছেন—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এরা জীবের শরীরের উপাদান। চক্ষু,কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল জ্ঞানলাভের মাধ্যমে এবং হাত পা প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়গুলি কাজ করার উপায়। কিন্তু এদের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। এরা প্রাণশক্তির দ্বারাই চালিত এবং সঞ্জীবিত হয়ে নিজ নিজ কাজগুলি করে। সেজন্য প্রাণশক্তিই দেহের ধারয়িতা। এই প্রাণশক্তি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত; সেগুলি হল—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। এদের মধ্যে মুখ্য হল প্রাণ। কিন্তু অনেক সময় অন্যরা তা মানতে চায় না। তারা ভাবে আমরাই বা কম কি-সে? একবার তেমন ঘটনাই ঘটেছিল। অন্যান্য প্রাণেরা ঝগড়া করছে কার কত বেশি শক্তি। কার জন্য দেহ রক্ষা পাচ্ছে—এই নিয়ে। সে-সময় মুখ্য প্রাণ তাদের বললেন—তোমরা মোহগ্রস্ত হয়ে বৃথা অভিমান করো না। আমি নিজেই প্রাণকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে এই দেহকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছি। অন্যান্য প্রাণেরা সব নিজের নিজের শক্তিতেই বিশ্বাসী। তাদের উপরওয়ালা যে কেউ আছেন এটা তারা ভাবতেই পারে না। বুঝতেও চায় না। তাই তারা মুখ্য প্রাণের কথার কোন গুরুত্বই দিল না। মুখ্য প্রাণ

দেখলেন এদের একটু শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তা না হলে এদের এই অহঙ্কার দূর হবে না। সেই চিন্তা করে তিনি শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলেন। তিনি যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছেন, তখন অন্যান্যরাও তাঁর সঙ্গে যেন স্রোতের টানের মত বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। আবার যখন তিনি স্থির হয়ে বসে থাকেন, তখন অন্যরাও স্থির হয়ে যায়। ঠিক যেমন মৌমাছিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়—রাণী মৌচাক ছেড়ে উড়ে যেতে চাইলে বাকি মৌমাছিরাও শন্ শন্ করে যেমন তার সঙ্গে চলে যায়, আবার সে ফিরে এসে বসলে তারাও ফিরে এসে শান্ত হয়ে বসে থাকে। এরকমই প্রাণ কয়েকবার উঠা ও বসা করতেই অন্যরা বুঝল যে তাদের শক্তি কতটুকু ও অস্তিত্ব কোথায় এবং শক্তির উৎস কে? তখন তারা তাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাভাবে স্তব করতে থাকে। স্তবগুলি হল—

প্রাণই অগ্নিরূপে তাপ দেয়, সূর্যরূপে জগৎকে প্রকাশিত করে। প্রাণই ইন্দ্র, বায়ু, পৃথিবী, চন্দ্র ও মেঘ। যা কিছু মূর্ত, অমূর্ত, স্থূল ও সূক্ষ্ম সবই প্রাণ। প্রাণই অমৃত,প্রাণই সেই অবিনাশী তত্ত্ব যা— এই বিকাশশীল জগৎকে ধরে আছে।

রথের চাকার নাভিতে শলাকাগুলি ঢুকে থাকে বলেই যেমন সেগুলি খুলে পড়ে না বা নড়াচড়া করতে পারে না, তেমনি বিশ্বের সমস্ত বস্তু প্রাণে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাণ সকলকে ধরে আছে বলেই তারা কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না। তারপর রথের চাকার গতির মধ্য দিয়েই শলাকাগুলির গতি যেমন নির্ধারিত হয়, সেরকম প্রাণের গতিশক্তি দ্বারাই জগতের সমস্ত কিছু পদার্থের চলন হয়ে থাকে। বেদসকল জ্ঞানের আকর। কর্মেরও প্রবর্তক। তাই বেদসমূহ প্রাণ। যজ্ঞ হল সকল কর্মের প্রতীক। প্রাণই সকল কর্ম। কারণ প্রাণশক্তিতেই সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হয়। প্রাণই এই মনুষ্যকুল। সর্বজাতীয় মানুষ প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করেই বিদ্যমান।

তুমি (প্রাণ) প্রজাপতি রূপে গর্ভে বিচরণ কর। তুমিই মাতা-পিতার প্রতিরূপ হয়ে জন্মাও। হে প্রাণ, তুমি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাদের অধিপতিরূপে প্রতি শরীরে বাস কর। তোমার জন্যই মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়পথে তোমাকে উপহার প্রদান করে।

তুমি দেবগণের জন্য যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক, তুমিই শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রথম প্রদত্ত অন্নের প্রাপক, তুমি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের দেহধারণাদি রূপ যথার্থ চেষ্টা, তুমি অঙ্গিরস্ভূত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অথর্বা (প্রাণ) অথবা, তুমি অথর্বা, অঙ্গিরস্ ইত্যাদি ঋষিদের (প্রাণ সমূহের) সত্যচরিত্র অর্থাৎ দেহধারণাদিরূপ যথার্থ (উপকারক) চেষ্টা।

হে প্রাণ তুমি ইন্দ্র, তুমি রুদ্রস্বরূপ অর্থাৎ জগতের সংহারকর্তা। স্থিতিকালে তুমিই সমগ্র জগতের রক্ষক। তুমি উদয় ও অস্তগমন দ্বারা অন্তরিক্ষে বিচরণ কর, তুমিই সূর্য ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রভু।

হে প্রাণ, তুমি যখন মেঘরূপে বর্ষণ কর সে সময় তোমার এ সকল প্রজা অর্থাৎ প্রাণিবর্গ এখন ইচ্ছামত অন্ন পাব এই ভেবে আনন্দে বাস করে।

হে প্রাণ, তুমি উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন। তুমি একর্ষি নামক অগ্নিরূপে সমস্ত যজ্ঞীয় দ্রব্যের ভক্ষক, তুমিই বিদ্যমান বিশ্বের পতি। হে মাতরিশ্বা, তুমি আমাদের পিতা।

তোমার যে রূপ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, যা কর্ণে প্রতিষ্ঠিত, যা চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত এবং যা সঙ্কল্পরূপে অবিচ্ছিন্নভাবে মনে ব্যাপ্ত সেই রূপকে কল্যাণময় কর, তুমি এই দেহ ছেড়ে যেও না।

এই ত্রিভুবনের মধ্যে যা-কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে প্রাণই সব কিছুর প্রভু। হে প্রাণ, তুমি যে কেবল আমাদের ঈশ্বর (প্রভু) তাই নয়, তুমি মায়ের মত স্নেহময়ী রক্ষয়িত্রী। অতএব পুত্রস্থানীয় আমাদের রক্ষা কর। তুমিই সকল লোকের পুরুষার্থের বিধাতা। তাই তোমার কাছে

আমরা সম্পদ ও বুদ্ধি প্রার্থনা করছি।

কবন্ধীর জিজ্ঞাসা শেষ হলে অশ্বলপুত্র কৌসল্য পিপ্পলাদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্, প্রাণের জন্ম কোথা থেকে হয়? প্রাণ এই শরীরে কি-ভাবে আসে? কি-ভাবে সে নিজেকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে এই শরীরে অবস্থান করে? কি-ভাবে সে এই দেহ-ইন্দ্রিয়াদি বস্তুকেও ধরে থাকে?

ঋষি বললেন—তুমি খুবই কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ। তুমি অতিশয় ব্রহ্মপরায়ণ। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

আত্মা থেকেই প্রাণ জন্মলাভ করে। ছায়া যেরকম পুরুষের দেহকে আশ্রয় করে থাকে, সেরকম এই প্রাণও আত্মাকেই আশ্রয় করে আছে। মনের ইচ্ছা সংকল্পাদি দ্বারাই প্রাণ এই শরীরে আসে।

সম্রাট যেরকম এক-একজন রাজাকে কতকগুলি গ্রাম দিয়ে বলেন—এ সকল গ্রাম শাসন কর এবং তিনি তাঁর নির্দেশে কাজ করেন। কারণ বিশাল দেশের বহু নগর, গ্রামের তিনি অধীশ্বর। সুতরাং সর্বত্র শাসন করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা তাঁর একার পক্ষে তো সম্ভব নয়—সেজন্যই এই ব্যবস্থা। তেমনি মুখ্য প্রাণেরও এই দেহের চুলের আগা থেকে নখের শেষ পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য। এই পুরো দেহ-সাম্রাজ্য যাতে ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিপালিত হয় সেজন্য অন্যান্য পাঁচ প্রাণকে পৃথক পৃথক দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। এবং তারা সকলেই মুখ্য প্রাণের নির্দেশে কাজ করে চলেছেন। কেউ কারও সীমা লঙ্ঘন করেন না।

এই প্রাণ অপানবায়ুকে মলদ্বারে ও জননেন্দ্রিয়ে নিযুক্ত করেন। প্রাণ নিজে মুখে ও নাকে বিচরণ করেন। থাকেন চক্ষু ও কর্ণে। প্রাণ ও অপানের মাঝখানে থাকে সমান। এই সমান বায়ুই জঠরাগ্নিতে আহুতিরূপে ভুক্ত অন্নকে হজম করে দেহের সঙ্গে সমতা করায় অর্থাৎ রস ও রক্তে পরিণত করে দেহকে পুষ্ট করে। জঠরাগ্নি হৃদয়দেশে

গেলে তার তেজ বা দীপ্তি থেকে সাতটি ইন্দ্রিয়ের দীপ্তি উৎপন্ন হয়।

হৃদয়াকাশে বা হৃদয়-পুণ্ডরীকই আত্মার স্থান। যোগিগণ-হৃদয়াকাশে জ্যোতিরূপে আত্মাকে দর্শন করেন। এ কারণে হৃদয়দেশকে আত্মার বাসস্থান বলা হয়েছে। এই হৃদয়ে আছে ১০১টি নাড়ী। এ-সকল নাড়ীর এক-একটিতে আবার একশ একশ করে শাখা নাড়ী আছে। প্রত্যেক শাখা নাড়ী আবার ৭২,০০০ প্রশাখায় বিভক্ত। এ-সকল নাড়ী ও তাদের শাখা এবং প্রশাখাতে ব্যানবায়ু বিচরণ করে।

আর জীবগণ মৃত্যুর পর পার্থিব লোক থেকে যে অন্যলোকে যায় সেই নিয়ে যাওয়ার কাজটি করে উদান বায়ু। উদানবায়ু পুণ্যবান লোককে পুণ্যলোকে এবং পাপকর্মকারী লোককে পাপলোকে নিয়ে যায়। আর যার পাপ ও পুণ্য দুই'ই সমান তাকে মনুষ্যলোকে নিয়ে যায়।

জীবের দেহে অবস্থিত যে প্রাণবায়ু দর্শন-ক্রিয়া উৎপাদন করে, অর্থাৎ দেখার শক্তি জোগায় তা সূর্যস্থ প্রাণশক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ। সূর্যই বাহ্য প্রাণ এবং সূর্য উদিত হলে সেই প্রাণশক্তি দ্বারা চাক্ষুষ প্রাণ উজ্জীবিত হয়ে উঠে। এবং সূর্যই চক্ষুর বিভিন্ন বস্তু দেখার জন্য আলো উৎপাদন করে। উভয়েরই ধর্ম সমান এবং বস্তুসমূহকে প্রকাশ করাই উভয়ের কাজ।

পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী যে প্রাণ-দেবতা তাই দেহস্থ অপান বায়ুর অনুগ্রাহক। এ-কারণে উভয়েই সমধর্মী। পৃথিবী বস্তুসকলকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করে। অপান বায়ুও দেহস্থিত মল-মূত্রকে নীচের দিকে আকর্ষণ করে নির্গত করে। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশ, সেই আকাশের অধিষ্ঠাতা প্রাণশক্তিই সমানবায়ুর অনুগ্রাহক। উভয়েই সমধর্মী। আকশস্থ প্রাণ দ্যুলোক ও ভূলোকের মাঝখানে অবস্থিত। সমানবায়ুও প্রাণ ও অপানের মাঝখানে অবস্থিত।

বাইরে যে সাধারণ বায়ু তার অধিষ্ঠাত্রী প্রাণশক্তিই ব্যান বায়ুর

অনুগ্রাহক। এই কারণে উভয়েই সমধর্মী। উভয়েরই সাধারণ ধর্ম ব্যাপ্তি। বাহ্য বায়ু সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে বিচরণ করে, ব্যান বায়ুও শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে বিচরণ করে।

বাহ্যিক আগ্নেয় তেজে যে প্রাণশক্তি বিদ্যমান তাই উদানবায়ুরূপে জীবদেহে কাজ করে থাকে। বাহ্যিক তেজের যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাই উদান বায়ুর অনুগ্রাহক। এ-কারণে উদানবায়ু তেজস্বভাব। মৃত্যুকালে উদানবায়ুর অনুগ্রহের অভাব হলেই জীবের স্বাভাবিক তেজ শান্ত (লুপ্ত) হয়ে যায়। তখন সেই মুমূর্ষু ক্ষীণতেজা পুরুষ দেহত্যাগের পর মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে দেহান্তর লাভ করে। সে সময় চিত্ত যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, সেভাবে জীব প্রাণকে আশ্রয় করে। প্রাণ তেজের দ্বারা উদানবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবকে পুণ্য পাপ কর্ম অনুযায়ী যেমন সঙ্কল্প তেমন লোকে নিয়ে যায়।

আশ্বলায়নের প্রশ্নের উত্তর শেষে মুনি বলছেন—যে কোনও বিদ্বান্ প্রাণকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁর কখনও পুত্র-পৌত্রাদির বিচ্ছেদ ঘটে না। তিনি অমরত্ব লাভ করেন। এ বিষয়ে বিশেষ একটি শ্লোকের অর্থ হল—প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, অবস্থান এবং আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক স্বরূপ যাঁরা জেনেছেন---তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন।

এতক্ষণ ঋষি পিপ্পলাদ যে দুর্জ্ঞেয় প্রাণের তত্ত্ব নিয়ে এত সহজভাবে এত কথা বললেন, তার অধিকারী কে? সে বিষয়ে মুনি মনুষ্যসমাজকে ওই ছয় ঋষিপুত্রের সূত্রেই ইঙ্গিত করেছেন যে—ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ যেমন হতে হবে, তেমনি ইন্দ্রিয়-সংযম, ব্রহ্মচর্য ও আস্তিক্যবুদ্ধিতেও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। মুনিপুত্রদের সে সবই থাকলেও তাঁদের সে বিষয়ে আরও প্রতিষ্ঠিত করতে নিজের তত্ত্বাবধানে এক বৎসর রেখে ঋষি তাঁদের সেভাবেই উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন।

স্বামী প্রণবানন্দজীও তেমনি মুক্তিকামী সাধকদের উদ্দেশ্যে

উপনিষদের নির্দেশ অনুসরণ করে আত্মপ্রস্তুতির নির্দেশ দিয়ে বলছেন—

"দৈনিক শাস্ত্রালোচনা করিও, দৈনিক নিয়মিতভাবে গীতা, উপনিষদ এবং যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্যশতক ও অন্যান্য বৈরাগ্য-ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ্ পাঠ করিও। ৪—৪। ৩০ ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইও না। শঙ্করাচার্যের বিবেক-বৈরাগ্য, বুদ্ধের ত্যাগ এবং চৈতন্যদেবের প্রেমের বিষয় ভাবিও। ....যম-নিয়ম-আসন অভ্যাস করিও, কোনও একটি নির্দিষ্ট আসনে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিও। কোন সময়ের জন্য, কোন মুহূর্তের জন্য যেন বাজে ভাবনা-চিন্তা মনে না আসিতে পারে। সতত সৎ চিন্তা, সদ্ভাবনা, সৎসঙ্কল্প করিবে যাহাতে মানসিক কুবৃত্তিগুলি সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ....পরিত্যজ্য ও পরিত্যক্ত বিষয় বা বস্তু যেমন আমাদের স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, তেমনি সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ের প্রতি যেন তোমার ঘৃণা বোধ হয়।

দৈনিক ৫/৬ ঘণ্টা জপ-ধ্যান করিও। অনেক সময় মৌন থাকিও। এমন অবস্থায় সর্বদা থাকিতে চেষ্টা করিবে—যেন বহির্জগতের কোন কিছু তোমাকে স্পর্শ না করিতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থ বিস্মৃতি-সাগরের অতল জলে নিমজ্জিত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হইবে না। মনকে এই জগৎ হইতে সরাইয়া যতই অন্তর্জগতের দিকে নিতে পারিবে, ততই মন স্থির হইবে ও বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হইতে থাকিবে।..."

তবেই এই দেহ, জগৎ ও বিশ্বজগতে যে প্রাণের খেলা চলেছে, তা অনুভবে শক্তি আসবে।

প্রশ্নোপনিষদ থেকে

ব্রহ্মই শক্তিমান

দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের একবার ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল। দেবতারা যেমন শক্তিমান, তেমনি শারীরিক শক্তিতে অসুরেরাও শক্তিমান। কিন্তু অসুরেরা যখন দেবতাদের আক্রমণ করে তখন দেবতারা প্রথম দিকে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন প্রাণ দিয়ে হলেও শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে হবে। যুদ্ধ- ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া তো আর যায় না। এরকম চিন্তা করে দেবতারা প্রতিজ্ঞা করলেন অসুরদের হারাতেই হবে।

দেবতারা মনে মনে এমন প্রতিজ্ঞা করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করেই কি-ভাবে যেন তাঁদের মনে শক্তি বেড়ে গেল, বেড়ে গেল শরীরেরও শক্তি। অসুরদের কাছে হেরে যেতে পারি বলে তাঁদের মনে যে ভয় হয়েছিল—তাও কোথায় চলে গেল। তখন তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে অসুরদের আক্রমণ করলেন।

অসুরেরা যুদ্ধে দেবতাদের প্রবল পরাক্রম দেখে ভয় পেয়ে যায়। তাদের মধ্যে যারা বড় বড় বীর তারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ভাবে, আজ বুঝি আর আমাদের জীবন- রক্ষা হবে না। তবুও দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হল। শেষ পর্যন্ত দেবতাদের হাতে ভীষণ মার খেয়ে অসুররা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে প্রাণে বাঁচল। যুদ্ধে দেবতারাই হলেন জয়ী।

অসুরদের হারিয়ে দেবতাদের আর আনন্দের সীমা নেই। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র রাজসভার মাঝে রত্নোজ্জ্বল সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর পাশাপাশি বসে আছেন অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ থেকে শুরু করে আরো যত সকল গণ্য-মান্য বড় বড় দেবতারা। তাঁরা সভায় বসে অসুরদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া যুদ্ধের বিষয়ে নানা কথাবার্তা বলছেন। সবাই নিজের নিজের শক্তি ও বুদ্ধির গর্ব করছেন। বলছেন একটু বাড়িয়েই। যেন তাঁদের বুদ্ধির জোর ছাড়া দেবতাদের পক্ষে জয় কিছুতেই সম্ভব হত না। সকলেই নিজ নিজ প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

নিজেদের শক্তির কথা চিন্তা করে তাঁদের যেন গর্বে বুক ফুলে ফুলে উঠছে।

ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। এই বিশ্ব-চরাচরে তাঁর অজানা কিছুই নয়। তিনি দেবতাদের এই মিথ্যা অহংকারের কথা মনে মনে বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরে তাঁদের গর্ব চূর্ণ করার জন্য এক অতি সুন্দর যক্ষের রূপ ধরে সেই দেবরাজ ইন্দ্রের সভার কিছু দূরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেবতাদের আলোচনায় মগ্ন হয়ে থাকলেও ইন্দ্র কিন্তু ওই সুন্দর যক্ষকে দেখেন। যক্ষকে দেখতে পেয়ে দেবরাজের মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে যায়। কিন্তু যক্ষ দেবসভার দিকে এগিয়ে না আসায় এবং তাঁদের দিকে একইভাবে তাকিয়ে থাকায় তাঁর সন্দেহ হয়। তাই ইন্দ্র বললেন— ওই সুন্দর জ্যোতির্ময় পুরুষটিকে দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু উনি আসতে আসতে হঠাৎ ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? আমাদের দিকে উনি ওভাবে তাকিয়েই-বা আছেন কেন? দেবতারা সবাই দেখলেন, কিন্তু কেউই তাঁকে চিনতে পারলেন না। এবার দেবরাজ তাঁর পাশেই বসে থাকা অগ্নিদেবকে বললেন—“হে জাতবেদা, তুমি একবার ওই যক্ষের কাছে গিয়ে জেনে আসতে পার যে তিনি কে? তিনি এখানে কেন এসেছেন? আর কিই-বা তিনি চান?

অগ্নিদেব সানন্দে দেবরাজের আদেশ পাওয়া মাত্র যক্ষের কাছে চলে গেলেন। তাঁর মনের ভাবটা এরকমই যেন, এত বড় ভীষণ যুদ্ধ জয় করে এলাম, আর এইটুকু কাজ আর আমার কাছে কি!

অগ্নিদেব যক্ষকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন কি, তার আগেই যক্ষ অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কে? আপনার পরিচয় কি?

অগ্নি বলেন—আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। আবার আমি জাতবেদা বলেও বিখ্যাত।

যক্ষ বলেন—তুমি যে অগ্নি তার প্রমাণ কি? তোমার কি ক্ষমতা আছে?

তার উত্তরে অগ্নিদেব বলেন— আমি মনে করলে এই জগৎ-সংসারে যেখানে যা-কিছু আছে সব পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পারি।

যক্ষ যেন বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়ে বলেন—আমি বিনা প্রমাণে তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না। বেশ, এই ঘাসটিকেই পোড়াও তো দেখি। বলেই তাঁর সামনে একটি ঘাস রাখলেন।

অগ্নি নিজের ক্ষমতার গর্বে উৎসাহিত হয়ে সেই ঘাসটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ভাবখানা যেন এইরকম যে, আমি ইচ্ছা করলে জগৎ-সংসারকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারি। কত বড় বড় বন, উপবন,মহাবন পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি, সেই আমার সামনে ইনি কি-না একখানা ঘাস রেখে বলছেন পুড়িয়ে দিতে। ইনি জানেনই না যে আমি কত বড় শক্তিমান। বেশ, আজ একবার ওঁকে দেখিয়ে দিতে চাই আমার কত ক্ষমতা। তারপর অগ্নি সেই ঘাসটাকে পোড়ানোর জন্য প্রথমে অল্প তেজ দিলেন। ভাবলেন এটুকু ঘাস এতেই ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু না, কিছুই হল না। তখন আরও একটু তেজ দিলেন— না তাতেও কিছু হল না। তখন আরও একটু তেজ—তাতেও না। অগ্নিদেব বিস্মিত হয়ে যাচ্ছেন ব্যাপারটা কি! এদিকে যক্ষের মুখে তখন হাসির রেখা। তা দেখে রাগে তিনি তখন সমস্ত তেজ প্রয়োগ করে দিলেন। সে তেজে ওই ঘাসটুকু কেন যক্ষেরও কিছুই অবশিষ্ট থাকার কথা নয়, এমন-কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তো পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু যক্ষ তো দূরের কথা, সেই ঘাসটুকুর সামান্যতম অংশকেও তিনি পোড়াতে পারলেন না।

লজ্জায়, অপমানে অগ্নিদেব মাথা নীচু করে দেবসভায় ফিরে এসে দেবরাজকে বললেন—এই পূজনীয়-স্বরূপ যে কে, তা আমি জানতে পারলাম না। তারপর সব ঘটনা দেবরাজ ইন্দ্রকে খুলে বললেন।

তখন দেবতারা বায়ুকে বললেন—হে বায়ু, তুমি আমাদের সামনে

দাঁড়িয়ে থাকা ওই যক্ষের কাছে গিয়ে জেনে এস যে তিনি কে।

বায়ুও সোৎসাহে যক্ষের কাছে চলে গেলেন। তাঁরও তো ক্ষমতার গর্ব কম নয়। নিজেকে তিনি কম তো ভাবেনই না, পরন্তু অগ্নির চেয়ে বেশী ক্ষমতাবান্ বলেই মনে করেন। কারণ তাঁর সাহায্য না পেলে অগ্নির শক্তি আর কতটুকু?

বায়ু বীরদর্পে যক্ষের কাছে গিয়ে পৌঁছালে সেই যক্ষরূপী ব্রহ্ম বললেন—তুমি কে? তোমার পরিচয় কি?

বায়ু বললেন—আমি বায়ু নামে জগতে প্রসিদ্ধ। আবার মাতরিশ্বা নামেও আমার জগতে খ্যাতি আছে।

বায়ুর কথা শুনে যক্ষ বললেন—তোমার যে এমন নাম তার সার্থকতা কি? তোমার কি শক্তি আছে?

বায়ু বলেন—আমি ইচ্ছা করলে এই জগতের সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।

তখন যক্ষ বলেন—তোমার মুখের কথায় তো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ঠিক আছে, বাস্তবে তুমি আমাকে করে দেখাও দেখি—তোমার ক্ষমতা কি রকম? তুমি এই ঘাসটিকেই উড়িয়ে ফেলে দাও। বলে একখানি ঘাস যক্ষ তাঁর সামনে রাখলেন।

বায়ু অবহেলা ভরে সেখানে এগিয়ে গিয়ে সেই ঘাসটিকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। প্রথমে অল্প শক্তি প্রয়োগ, তারপর ক্রমশঃ শক্তি বাড়িয়ে বাড়িয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। তবুও সেই ঘাসটিকে এক চুলও নড়াতে পারলেন না। লজ্জায়, অপমানে বায়ুদেবের মুখখানা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। অসুরদের জয় করে যে বায়ু এত শক্তির গর্ব করছিলেন তিনিও মাথাটি নীচু করে দেবরাজের কাছে গিয়ে বললেন—এ পূজনীয়- স্বরূপ যে কে, তা আমি জানতেই পারলাম না।

তারপর দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবতারা বললেন—হে মঘবন্‌, তুমি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যক্ষের কাছে গিয়ে জেনে এসো ইনি প্রকৃতপক্ষে কে?

অগ্নি এবং বায়ু দু'জনকেই যক্ষের কাছে গিয়ে নিজেদের শক্তির গর্ব চূর্ণ হতে দেখে এবং তাঁরা যক্ষের পরিচয় না আনতে পারায়—ইন্দ্র ধরেই নিয়েছিলেন—ইনি সাধারণ কেউ নন, ইনি নিঃসন্দেহে কোন অসাধারণ শক্তিমান। তাই এবার তাঁর নিজেরও যক্ষের কাছে যাওয়া উচিত মনে করছিলেন। সেজন্য দেবতারা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্র যক্ষের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি রওনা হলেন।

কিন্তু ইন্দ্র তাঁর মুখোমুখি হওয়ার আগেই সেই যক্ষ গেলেন অদৃশ্য হয়ে।

দেবরাজ অবাক হয়ে গিয়ে ভাবছেন—একি! যিনি এতক্ষণ ছিলেন তিনি গেলেন কোথায়? এই ভাবতে ভাবতে ইন্দ্র দেখেন—সোনার অলংকারে ভূষিতা স্বর্ণবর্ণা এক উজ্জ্বল নারী—উমা, যিনি হিমালয়ের কন্যা, শিবের স্ত্রী, সারা জগতের মা এবং যিনি ব্রহ্মবিদ্যা নামে জগতে আরাধিতা, সেই স্বয়ং তিনিই তাঁর সামনে। দেবরাজ তখন তাঁর কাছেই এগিয়ে গেলেন।

তাঁকে প্রণাম করে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করছেন—মা, এই পূজনীয় স্বরূপ যক্ষটি কে? তিনি আমাকে দেখা না দিয়েই কেন চলে গেলেন?

দেবরাজের ব্যাকুলতায় মা উমা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তুমি যাঁকে দেখতে পাওনি, জানতে পারনি—উনিই সেই ব্রহ্ম। উনিই এই জগতের বিধাতা। ওঁর শক্তিতেই সবাই শক্তিমান। ওঁর শক্তি না পেলে কারও কিছুই করার ক্ষমতা থাকে না। ওঁরই ইচ্ছায় তোমার কাছে আমি এসেছি।

তোমরা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছ। জয়ী হয়েছ। কিন্তু যাঁর দয়ায় তোমরা জয়ী হলে, সে-ই তাঁরই দয়ার কথা না মনে রেখে তোমরা

তোমাদের ক্ষমতার গর্বেই মেতে উঠেছিলে। তার জন্য তোমাদের কত গর্ব, কত অহংকার। সে-জন্যই উনি এসে তোমাদের সাবধান করে দিলেন।

শুনে ইন্দ্র খুব আনন্দিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন—কি ভীষণ ভুলই না হচ্ছিল। দেবসভায় ফিরে এসে তিনি নিজের অভিমানের কথা ভুলে সেই সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির কথাই চিন্তা করতে থাকলেন।

দেবতাদের মধ্যে শুধু দেবরাজ ইন্দ্রই শুদ্ধ এবং খোলা মন নিয়ে উমার মুখ থেকে ব্রহ্মের পরিচয় জানতে পেরেছিলেন। আর ব্রহ্মরূপী যক্ষের সঙ্গে কথা বলে এবং নিজেদের শক্তি দেখাতে গিয়ে অগ্নি ও বায়ু তাঁকে কিছুটা বুঝেছিলেন। যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যা উমার কাছ থেকে এবং নিজের অন্তর থেকে ও সবার আগে তাঁকে জানতে পেরেছিলেন—তাই তিনি সবার সেরা। তারপর অগ্নি এবং পবনদেবের স্থান।

যাঁর শক্তিতে সকলে শক্তিমান, তাঁর প্রতি সতত শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস-আনুগত্য-কৃতজ্ঞতা রাখার যে উপদেশ এই উপাখ্যানে উপনিষদ দিচ্ছেন স্বামী প্রণবানন্দজী সঙ্ঘের শিষ্য, ভক্ত, আশ্রিত, শরণাগত মানুষদের লক্ষ্য করে যেন সে কথাই আবার বলছেন—

নিজেদের ভ্রান্ত বুদ্ধির গর্ব না রাখিয়া আশ্রয়দাতার কথা অনুসারে চলিতে পারিলে নির্দিষ্টকালের ভিতরে জীবের চির ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে পারিবে।

তাঁর করুণা ছাড়া তাঁর শরণাগত সকল নরনারী ব্রহ্মের কৃপাবিহীন দেবতাদের মতই যে শক্তিহীন ও দুর্বল—সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই তিনি আরও বলছেন—

সঙ্ঘনেতাগতপ্রাণ সন্তানদের ভিতর দিয়াই সঙ্ঘনেতার ভাব ও শক্তি সকলের নিকট পৌঁছিতে পারে—সঙ্ঘ-সন্তানদের প্রাণে

এই ভাব ও সঙ্কল্প থাকিলে তাহারা আমার শক্তি অনুভব করিতে পারিবে। তাহা না হইলে তাহারা কি কাজ করিবে? আমার শক্তি না পাইলে কে কি করিতে পারে?

কেনোপনিষদ থেকে

ঋষি চক্রায়ণ-উষস্তি

কুরুদেশে একবার প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়। সে শিলাবৃষ্টিতে মাঠের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে দেশে খাবারের খুবই অভাব দেখা দেয়। ওই সময় দেশের মানুষেরা জীবন বাঁচানোর তাগিদে অন্যান্য রাজার রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হয়। কুরুদেশেই থাকতেন চক্র ঋষির ছেলে ঋষি উষস্তি, আর তাঁর অল্পবয়স্কা স্ত্রী আটিকী। তাঁরাও খাওয়ার অভাবে দেশ ছেড়ে চলে যান। নিজ দেশ ছেড়ে তাঁরা অন্য এক দেশের হস্তিপকদের গ্রামে আশ্রয় নেন। তখন তাঁদের একে তো অন্তরে ধনের অভাবের জন্য দুঃখ, তার উপর দেশত্যাগের যন্ত্রণা। তার চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক হল পেটের ক্ষুধা।

সেই গ্রামে গিয়ে ঋষি উষস্তি স্ত্রী আটিকীকে এক নিরাপদ স্থানে রেখে বের হলেন খাবারের সন্ধানে। খাবার সন্ধান করতে করতে তিনি দেখলেন—একজন হস্তিপককে কদর্য মাষ-কলাই খেতে। তা দেখে তার কাছেই খাবার ভিক্ষা চাইলেন। তিনি বলেন—আমার বড়ই খিদের জ্বালা। আমাকে কিছু খাবার ভিক্ষা দাও। সেই হস্তিপক তাঁর কথা শুনে বলে—আমার ঘরে খাবার বলতে যা কিছু মাষ-কলাই ছিল সবই আমার এই থালায় নিয়ে নিয়েছি। আর তা তো আমি উচ্ছিষ্টও করে ফেলেছি। সুতরাং তোমাকে কি করে দিই। তাছাড়া আমার ঘরের ভাঁড়ারেও আর এমন কিছু নেই, যা তোমাকে আমি খেতে দিতে পারি।

উষস্তি বুঝলেন অভাব এখানেও। তাই নিরুপায় হয়েই বলেন—তুমি যা খাচ্ছ তার থেকেই আমাকেও কিছু দাও। খুবই খিদে পেয়েছে। হস্তিপকও পড়েছে সমস্যায়। ক্ষুধাতুর মানুষকে কি করে সে ফিরিয়ে দেয়। তাছাড়া তিনি যখন নিজে থেকেই উচ্ছিষ্ট জেনে-শুনেও খেতে চাইছেন, তখন বাধ্য হয়েই হস্তিপক নিজের থালা থেকেই কিছু খাবার

দেয় উষস্তিকে। উষস্তিও তা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোগ্রাসে খেতে শুরু করে দেন। পুরো খিদে না মিটলেও নিজে কিছু খেয়ে কিছু রাখলেন স্ত্রী আটিকীর জন্য। হস্তিপক বলে এই খাবার জলও তাহলে নিয়ে খান। উষস্তি বলেন—না, ওই জল তো তোমার উচ্ছিষ্ট। ওটা খেলে আমার উচ্ছিষ্ট খাওয়া হবে। সুতরাং প্রয়োজন নেই।

উষস্তির কথায় হস্তিপক তো রীতিমত বিস্মিত। বলেন কি! উচ্ছিষ্ট মাষ-কলাইগুলি খেতে কোন অসুবিধা হল না, অথচ জলের বেলায় যত অসুবিধা হয়ে গেল। এ-তো আশ্চর্য নীতি! হস্তিপক তার মনের ভাব উষস্তিকে বলেই ফেলে। বলে—মাষ-কলাইগুলি কি উচ্ছিষ্ট নয়? তার কথা শুনে উষস্তি বলেন—ওই মাষ-কলাই দানা যদি না খেতাম, তাহলে খিদের জ্বালায় হয়তো মরেই যেতাম। তাই জীবনরক্ষার প্রয়োজনেই উচ্ছিষ্ট হলেও ওগুলি বাধ্য হয়েই খেয়েছি। কিন্তু এখনই জল না খেলেও আর সেরকম কষ্ট তো হচ্ছে না। তা ছাড়া খাদ্যের অভাব হলেও দেশে জলের অভাব তো নেই। যখন ইচ্ছে হবে তখনই জল সংগ্রহ করে নেব। সুতরাং ওই উচ্ছিষ্ট জল খাওয়ার প্রয়োজন কি? উষস্তির এমন কথার পর হস্তিপক আব কিছু বলতে পারল না। উষস্তিও সেখান থেকে সেই মাষ-কলাইগুলি নিয়ে স্ত্রী আটিকীর কাছে চলে আসেন। আটিকী সেগুলি নিলেও তিনি খেলেন না। কারণ উষস্তি ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে গেলে তিনি ভাল ভাল খাবার পেয়ে খেয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর খিদেও ছিল না।

পরের দিন সকালে উষস্তি শুনলেন—কাছেই এদেশের রাজা যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। অনেক দান-ধ্যানও করবেন। স্ত্রী আটিকীকে তখন বললেন—যদি কিছু খাদ্য থাকত, তাহলে তা খেয়ে রাজার যজ্ঞে যেতে পারতাম। সেখানে গেলে রাজা হয়তো অবশ্যই আমাকে ঋত্বিকের কাজে নিযুক্ত করতেন। তাতে বেশ কিছু ধন পাওয়া যেত।

তাঁর কথা শুনে আটিকী বললেন—তাই যদি হয়, তবে কাল যে কুৎসিত মাষ-কলাইগুলি আমাকে খাওয়ার জন্য এনে দিয়েছিলে, সেগুলো তো আমি খাইনি, সবই পড়ে আছে। সেগুলি খেয়েই তুমি যাও। উষস্তি আর কোন কথা না বলে সেই খাবারগুলি খেয়েই তাড়াতাড়ি রাজার যজ্ঞসভায় গিয়ে হাজির হলেন।

সেখানে তিনি দেখলেন—লোকে লোকারণ্য যজ্ঞসভা। যজ্ঞ এখনই শুরু হবে। দেখলেন—প্রস্তাব-পাঠক, উদ্‌গাতা, প্রতিহর্তা সবাই যজ্ঞ শুরু করার অপেক্ষায়। উষস্তি আস্তে আস্তে গিয়ে উদ্‌গাতাদের কাছে বসলেন।

যজ্ঞ শুরু হচ্ছে। প্রস্তাব-পাঠকও প্রস্তুত হয়েছেন যজ্ঞের প্রস্তাব-অংশের গানের জন্য। উষস্তি প্রস্তাব-পাঠককে লক্ষ্য করে বলে উঠেন—প্রস্তাব-পাঠক, প্রস্তাবে যে দেবতা অনুগত আছেন, যে দেবতাকে উদ্দেশ্য করে তোমার প্রস্তাব পাঠ, যদি তুমি তাঁকে না জেনে প্রস্তাব পাঠ কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হবে।

উষস্তির কথা শুনে প্রস্তাব-পাঠক চিন্তিত হয়ে গেলেন। ভয়ে তিনি আর 'প্রস্তাব' পাঠ করতে পারলেন না। যজ্ঞসভার সকলেই এমন-কি রাজাও বিস্মিত হয়ে যান।

এরপর উদ্‌গাতাকেও উষস্তি বলে উঠলেন — হে উদ্‌গাতা, উদ্‌গীথে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁকে না জেনে তুমি উদ্‌গীথ গান করলে তোমার মুণ্ডপাত হবে।

উদ্‌গাতাও ওই অপরিচিত মানুষটির কথা শুনে হতবাক্। তিনিও ভয় পেয়ে গেলেন। আর উদ্‌গীথ গান করতে সাহসী হলেন না।

একই কথা উষস্তি প্রতিহারপাঠককেও বলেন—হে প্রতিহার-পাঠক, প্রতিহারে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁকে না জেনে যদি তুমি প্রতিহার পাঠ কর, তাহলে তোমার মুণ্ডপাত হবে।

প্রতিহার পাঠকও অজ্ঞাতপরিচয় আগন্তুকের কথায় ভয় পেয়ে গেলেন। তিনিও হতবাক্।

সারা যজ্ঞসভার লোকজনের মুখের ভাব তখন থমথমে। রাজাও চিন্তিত। তিনি ভাবছেন—ইনি কে? তারপর রাজা সেই ঋষিকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে বলেন—আমি আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি। উষস্তি বলেন—আমি চাক্রায়ণ, চক্রের সন্তান উষস্তি। শুনেই রাজা যেন আনন্দে উল্লসিত হয়ে বলেন—আমি খুবই ভাগ্যবান। আমি এই যজ্ঞের কাজের জন্য আপনাকে কতই না খোঁজ করেছি। কিন্তু কোনওভাবেই না পেয়ে অন্যদের ঋত্বিকের কাজে নিযুক্ত করেছি। এখন অনুগ্রহ করে যখন আপনি আমার যজ্ঞে নিজে থেকেই উপস্থিত হয়েছেন—তখন আপনিই ঋত্বিকের দায়িত্ব নিয়ে এই যজ্ঞ করুন।

উষস্তির মনে ধনের আকাঙ্ক্ষা ছিলই। তাই রাজা বলার সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে গেলেন। বলেন আপনার যখন এমনই আগ্রহ তখন আমিও রাজী। তবে শর্ত, এঁদেরকে আপনি যজ্ঞের জন্য যে পরিমাণ ধন দিবেন, আমাকেও তাই দিতে হবে।

যজমান রাজা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। তিনি বলেন—ঠিক আছে তাই হবে। যজ্ঞসভায় উপস্থিত সকলের দুশ্চিন্তা কেটে গেল। যজ্ঞ এখনই শুরু হবে চিন্তা করে সকলেই হলেন উৎসাহিত।

তারপর যজ্ঞের প্রস্তোতা বা 'প্রস্তাব' অংশের পাঠক উষস্তির কাছে গিয়ে জানতে চান—আপনি আমাকে বলেছিলেন—হে প্রস্তাব-পাঠক, প্রস্তাবে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাকে না জেনে যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ কর তবে তোমার মুণ্ডপাত হবে।— সেই দেবতাটি কে?

উষস্তি বলেন—এই চরাচরের প্রাণীসকল প্রলয়কালে প্রাণেই সর্বতোভাবে প্রবেশ করে এবং সৃষ্টিকালে প্রাণ থেকেই উৎপন্ন হন।

ওই প্রাণদেবতাই প্রস্তাবে অনুগত হয়ে আছেন। তাঁকে না জেনে যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করতে, তবে অবশ্যই তোমার মুণ্ডপাত হত।

এরপর উদ্‌গাতা এসে উষস্তির কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি বলেছিলেন—হে উদ্‌গীথগায়ক, 'উদ্‌গীথ' অংশে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁকে না জেনে যদি তুমি উদগীথ গান কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হবে। সেই দেবতাটি কে?

উষস্তি বলেন—আদিত্যই সেই দেবতা। চরাচরের ভূতসকল ঊর্ধ্বে অবস্থিত আদিত্যের স্তব করে থাকেন। সেই আদিত্য দেবতাই উদ্‌গীথ অংশে অনুগত হয়ে আছেন। তাঁকে না জেনে তুমি যদি উদ্‌গীথ গান করতে, তবে আমার অভিশাপে তোমার মুণ্ডপাত হত।

তারপর প্রতিহর্তা সবিনয়ে উষস্তির কাছে গিয়ে বলেন—আপনি আমাকে বলেছিলেন—হে প্রতিহার-পাঠক, যে দেবতা প্রতিহার অংশে অনুগত আছেন তাঁকে না জেনে যদি তুমি প্রতিহার পাঠ কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হবে।— সেই দেবতাটি কে?

উষস্তি বলেন—অন্নই সেই দেবতা, চরাচরে এই ভূত সকল অন্নকে নিজের দ্রব্য বলে আহরণ করে জীবনধারণ করে। সেই অন্নদেবতাই প্রতিহারে অনুগত হয়ে আছেন। তাঁকে না জেনে যদি তুমি প্রতিহার পাঠ করতে, তবে আমার অভিশাপে তোমার মুণ্ডপাত হত।

এরপর উষস্তির পরিচালনায় যজ্ঞ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হ'ল। রাজা সহ সকলে খুবই খুশী হলেন। ঋষি উষস্তি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ধন নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন আর প্রস্তাব-পাঠক, উদ্‌গাতা ও প্রতিহর্তা প্রাণ, আদিত্য ও অন্ন সম্পর্কে রহস্য জেনে ধন্য হলেন।

স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বলেছেন—**যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।** এই উপাখ্যানটির যেন যুগপুরুষের সেই বাণীর সঙ্গে যথাযথভাবেই মিল রয়েছে। তাই দেখা যায় যে, ঋষি উষস্তি ক্ষুধার জ্বালায় জীবন-রক্ষার তাগিদে নিষিদ্ধ খাদ্য (উচ্ছিষ্ট খাবার) যতটুকু আহারের প্রয়োজন সেটুকুই মাত্র গ্রহণ

করেছেন। হস্তিপক জলপানের জন্য অনুরোধ করলেও তিনি জলপান করেননি। কারণ, তখন দেশে খাদ্যাভাব ছিল, জলের অভাব হয়নি। সুতরাং অল্প চেষ্টা করলেই তিনি জল পেয়ে যাবেন। তাই হস্তিপক তাঁর জলগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে বিস্মিত বা মনক্ষুণ্ণ হলেও তিনি নিজ আদর্শ ভ্রষ্ট হননি। এটি যেমন তাঁর আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় বহন করে, তেমনি তিনি যখন রাজার যজ্ঞসভায় ঋত্বিকদের যজ্ঞের কাজে জ্ঞানের অভাব দেখেছেন তখনও নীরব না থেকে তাঁর যথোচিত কর্ম করেছেন। তাতে যজ্ঞ সফল হয়েছে, দেবতারাও সন্তুষ্ট হয়েছেন, পরন্তু রাজা, প্রজা সকলেরই কল্যাণ হয়েছে। ওই যজ্ঞসভায় তিনি নীরব থাকলে তা হত না।

তাছাড়া উষস্তির পরিচয় পাওয়ার পর যখন রাজা তাঁকে ঋত্বিকের আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি অন্যান্য ঋত্বিকদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই ঋত্বিকের কাজ করেছেন এবং তিনি তাঁদের চেয়ে বেশী ধনের দাবী না করে সমান পাওনা দাবী করে নিজ আদর্শবোধের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সংযমেরও পরিচয় দিয়েছেন। তাই এখানে স্বামী প্রণবানন্দজীর অন্য একটি বাণীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি, যা উপনিষদীয় ভাবনায় সমৃদ্ধ ও উপনিষদীয় জ্ঞান অর্জনে একান্ত সহায়ক

আদর্শই জীবন, আদর্শ-সাধনার সঙ্কল্পই জীবনের প্রকৃত উৎস। প্রকৃত মানুষ যে সে আদর্শের জন্য, স্বীয় মহৎ সঙ্কল্প সাধনার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয় ; কিন্তু জীবনধারণের জন্য আদর্শ, আদর্শ-সাধনার মহৎ সঙ্কল্পকে বিসর্জন দেয় না। আদর্শহীন জীবন মৃত্যুরই নামান্তর। জীবনের আদর্শই যদি নষ্ট হয়, সাধনার সঙ্কল্পই যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে আর বাঁচিয়া লাভ কি ?

ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে

রাজা জনকের জ্ঞান-পিপাসা

রাজা জনক দানশীল। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানী। রাজা হয়েও তিনি ঋষির মত জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তাঁর রাজসভা সবসময় জ্ঞানী-গুণী-বেদজ্ঞ পণ্ডিতে আলোকিত হয়ে থাকে ইত্যাদি। এরকম কিছু কথা এর আগের একটি গল্পে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি কতখানি জ্ঞানপিপাসু ছিলেন সে কথা সেখানে বলা হয়নি। বলা হয়নি তিনি জ্ঞানলাভের জন্য অকাতরে, নিঃসঙ্কোচে অর্থ, বিত্ত, ধন, সম্পদ, সোনা-দানা—এমনকি রাজ্যও পর্যন্ত দান করে দিতেন। এখানে সেই সম্পর্কে ছোট্ট একটি গল্প বলছি।

রাজা জনক একদিন তাঁর রাজসভায় রত্নসিংহাসনে বসে আছেন। এমন সময় সেখানে এলেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। —যিনি তার আগে রাজার বিরাট যজ্ঞে এসে সব ব্রহ্মিষ্ঠ ঋষিদের শাস্ত্র-জ্ঞানে হারিয়ে ব্রহ্মিষ্ঠতম হয়ে এক হাজার গাভী (যে গাভীগুলির শিং দুটিতে ১০ পাদ করে সোনা লাগানো ছিল।) জয় করে নিয়ে গেছেন।

রাজা ঋষিকে আসতে দেখে তাঁকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে ও আদর করে উপযুক্ত আসনে বসালেন। তাবপর তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেন—ঋষিবর, কি ব্যাপার? আপনি আবার আমার এখানে এলেন কেন? আপনার কি আরো গাভী বা বৃষ চাই? অথবা সূক্ষতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করতে চান? ঋষি বললেন—সম্রাট্, আমার উভয় ইচ্ছাই আছে।

তারপর জনককে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—আপনার রাজসভায় জ্ঞানীজনেরা সব সময়ই আসেন। ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনায় অনেক আচার্য নিশ্চয়ই আপনাকে ব্রহ্মবিষয়ে বহু তত্ত্বকথাই হয়তো বলেছেন। তাঁরা কি বলেছেন তাই আমার জানার ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি আমাকে বলুন। রাজা বলেন—আমাকে বহু আচার্য অবশ্য বহু উপদেশই দিয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে ছ'জন আচার্য আমাকে যে উপদেশ দিয়ে গেছেন তাই আপনাকে এক এক করে বলছি।

জনক বলতে লাগলেন—আচার্য শিলিনিপুত্র জিত্বা আমাকে বলেছেন যে, বাগদেবতাই ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর কথা শুনে বললেন—শিশুকালে মা যেমন তাঁর শিশু-সন্তানকে, কৈশোরে যেমন বাবা ছেলেকে, পরে শিক্ষাগুরু যেমন ছাত্রকে উপদেশ দিয়ে সন্তানকে যোগ্য করে তোলেন, তেমনি আচার্য জিত্বাও মা, বাবা এবং শিক্ষাগুরুর মতই আপনাকে শিখিয়েছেন—বাগ্‌দেবতাই ব্রহ্ম। জনক বললেন—হে ঋষি, আমিও যে তাই বিশ্বাস করি এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ যার বাক্‌শক্তিই নেই, সে কোন বস্তুই লাভ করতে পারে না। তার জীবনের কোনও দামই নেই।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন— হে রাজন, আপনার আচার্য সঠিক শিক্ষাই দিয়েছেন। কিন্তু আচার্য জিত্বা কি ওই বাক্‌রূপী ব্রহ্মের শরীর সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছেন? জনক বললেন—না, প্রভু। তিনি তেমন কোন উপদেশ আমাকে দেননি। যাজ্ঞবল্ক্য এবার বললেন, রাজন্—ব্রহ্ম চারি পাদ। বাক্ ব্রহ্ম হলেন সেই চারি পাদের মাত্র এক পাদ। চারিপাদ পূর্ণ ব্রহ্মকেই জানতে হবে। একপাদ ব্রহ্মের উপাসনায় কোন কাজ হবে না। রাজা জনক তাঁর কথা শুনে বললেন—হে ঋষি, এই বাক্‌রূপী ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় সম্পর্কে যদি আপনার কিছু জানা থাকে, তাহলে সে বিষয়ে আমাকে বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—হে রাজর্ষি, এই বাক্‌রূপী ব্রহ্মের বাক্‌ই শরীর। আর অব্যাকৃতই হল আশ্রয়। এই বাক্‌রূপী ব্রহ্মকে প্রজ্ঞা বলে উপাসনা করা উচিত। জনক জিজ্ঞাসা করলেন প্রজ্ঞা কি? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—বাগিন্দ্রিয়ই প্রজ্ঞা। বাক্ দিয়েই ব্রহ্মকে জানা যায়। ঋক্, সাম, যজুঃ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যা, যাগ, হোম, অপান, পান, দান, ইহলোক, পরলোক সবকিছুই এই বাক্ দিয়েই জানা যায়। সেজন্য বাক্‌ই পরমব্রহ্ম। হে রাজর্ষি এভাবে বাক্-বিজ্ঞানকে জেনে যে তার উপাসনা করে, বাক্‌ব্রহ্ম তাকে কোন সময় ত্যাগ করে না। সমগ্র জগতেব প্রাণীকুল তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে দেবতা

হয়ে দেবগণকেই লাভ করে।

যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে বাক-বিষয়ে এমন সুন্দর জ্ঞানলাভ করে রাজর্ষি জনক্ খুবই আনন্দিত হয়ে বললেন—হে ব্রহ্মিষ্ঠ, এই জ্ঞান দেওয়ার জন্য আমার গোশালা থেকে হাতির মত বড় বড় এক হাজার বৃষ আমি আপনাকে দান করছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—আমার পিতা মনে করতেন শিষ্যের জ্ঞান-পিপাসা পূর্ণ না করে দান নেওয়া ঠিক নয়। আমিও তাই মেনে চলি।

এরপর যাজ্ঞবল্ক্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন—আর কোন আচার্য কি আপনাকে কোন কিছু উপদেশ দিয়েছেন? রাজা বললেন—শুল্বের পুত্র আচার্য উদঙ্ক শৌল্বায়ন আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—প্রাণই ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—হ্যাঁ, আচার্য আপনাকে মা, বাবা, ও শিক্ষাগুরুর মত সঠিক শিক্ষাই দিয়েছেন। কারণ, প্রাণহীন মানুষ তো একটা জড় বস্তু। প্রাণহীন যে তার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু হে রাজর্ষি, তিনি কি আপনাকে বলেছেন—প্রাণের শরীর কি রকম? বা সে থাকে কোথায়? জনক বলেন হে ব্রহ্মিষ্ঠ, না, তিনি তো তা বলেননি। যাজ্ঞবল্ক্য তখন বলেন—তাহলে শুনুন— চারিপাদ ব্রহ্মের প্রাণও একটি পাদ। এই একপাদ ব্রহ্মের স্বরূপ জানা আবশ্যক। অন্যথায় ব্রহ্মের উপাসনা ব্যর্থই হয়। জনক বললেন—আপনিই অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—প্রাণই প্রাণের শরীর। আর তার সর্বকালের অবস্থান বা আশ্রয় হল আকাশ। এই প্রাণকেই প্রিয় মনে করে উপাসনা করতে হয়। জনক বলেন—প্রিয় বলতে আপনি কি বুঝাতে চাইছেন? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—প্রাণই প্রিয়। প্রাণকে প্রিয় বলে মনে করার জন্যই তো মানুষ সেই প্রাণকে রক্ষা করার জন্য কতকিছু করে। এই প্রাণরক্ষার জন্য যার যজ্ঞে অধিকার নেই, সে যজ্ঞ করছে। যার কাছ থেকে কোন দান নেওয়া উচিত নয়, তার কাছেও মানুষ দান নিচ্ছে। মানুষ বিপদের সম্ভাবনা জানা সত্ত্বেও যে সেখানেই যায়—তাতো প্রাণকে ভালবাসার

জন্যই। প্রাণ যদি মানুষের এত প্রিয় না হত, প্রাণকে যদি মানুষ এত প্রিয় বলে না ভাবত, তাহলে সে এসব করতে পারত? তাই মহারাজ, প্রাণই ব্রহ্ম এরকম মনে করে যে ব্রহ্মের উপাসনা করে—সেই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা করে। প্রাণ তাকে কখনও ত্যাগ করে না। সে অনন্ত প্রাণের অধিকারী হয় এবং প্রাণকে জেনে দেবতা হয়ে দেবগণকেই পায়।

প্রাণবিজ্ঞান বিষয়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে রাজা জনক এমন সুন্দর জ্ঞান পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং ঋষিকে তিনি আরও হাতির মত বড় বড় এক হাজার বৃষ দক্ষিণা রূপে দান করলে যাজ্ঞবল্ক্য সেই একই কথাই বলেন।

এরপর ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য আবার রাজর্ষি জনককে জিজ্ঞাসা করেন—আর কোন আচার্য কি আপনাকে ব্রহ্ম বিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়েছেন? জনক বললেন—হ্যাঁ, বৃষ্ণুপুত্র বর্কু আমাকে বলেছেন—চক্ষুই ব্রহ্ম। ঋষি বললেন—মহারাজ, আচার্য বার্ষ্ণ আপনাকে মা, বাবা, শিক্ষাগুরুর মতই আন্তরিকতা সহ যে উপদেশ দিয়েছেন—তা অত্যন্ত সঠিক। চক্ষুই ব্রহ্ম। কারণ যে চোখে দেখে না বিশ্বভুবনই তার কাছে অন্ধকার। সে কোন্ বস্তু লাভ করবে? তবে ঋষি বর্কু কি এই চক্ষুর শরীর বা তার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আপনাকে কিছু বলেছেন? জনক বলেন—তা তো তিনি আমাকে কিছু বলেননি। রাজা বললেন—তাহলে কৃপা করে আপনিই আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিন। ঋষি বলেন—চারিপাদ ব্রহ্মের মাত্র একপাদ হল চক্ষু।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—মহারাজ, চক্ষুই চক্ষুর শরীর। আর আকাশ হল তার প্রতিষ্ঠা। সত্য বলেই চক্ষু-ব্রহ্মের উপাসনা করতে হয়। জনক বললেন—সত্যতা বলতে আপনি কি বুঝাতে চাইছেন? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—হে রাজা, চক্ষুরিন্দ্রয়ই সত্য, কারণ যে নিজে চোখে কিছু দেখেছে তাকে যদি লোকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি দেখেছ। তখন সে যদি বলে আমি দেখেছি—তবে তাই সত্য হয়ে থাকে। কারণ

চক্ষুই পরম ব্রহ্ম যে এরকমভাবে জেনে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, চক্ষু তাকে কোনদিন ত্যাগ করে না। নিখিলপ্রাণী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন সে দেবতা হয়ে দেবতাদের লাভ করে।

চক্ষু বিষয়ে এমন গভীর জ্ঞান পেয়ে রাজা খুশি হয়ে ঋষিকে হাতীর মত বড় বড় আরো এক হাজার বৃষ দান করলেন। দান বিষয়ে এবারও ঋষির সেই একই কথা।

যাজ্ঞবল্ক্য রাজাকে আবার জিজ্ঞাসা করেন ব্রহ্ম বিষয়ে আর কোন আচার্য কি আপনাকে কোনও উপদেশ দিয়েছেন?

জনক বললেন—ভরদ্বাজ গোত্রের গর্দভীবিপীত ভারদ্বাজ ঋষি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন — শ্রোত্রই ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—মা, বাবা ও শিক্ষাগুরুর মতই ঋষি আপনাকে সঠিক শিক্ষা দিয়েছেন—শ্রোত্রই ব্রহ্ম। মানুষ যদি কানে না শুনে, সে যদি বধির হয় তাহলে সে কোন বস্তু লাভ করতে পারে? পরন্তু আচার্য ভারদ্বাজ সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় সম্বন্ধে কিছু বলেছেন? জনক বলেন—তাতো তিনি আমাকে কিছুই বলেননি। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—ব্রহ্মের চারিপাদের শ্রোত্র-ব্রহ্মও একটি পাদ মাত্র। তাঁকে সম্পূর্ণভাবে না জানলে উপাসনায় ফল হয় না। জনক বলেন—তাহলে আপনি যদি জানেন তবে দয়া করে সে-বিষয়ে আমাকে বলুন।

ঋষি বলেন—শ্রবণেন্দ্রিয়ই এর শরীর। আর আকাশ এর প্রতিষ্ঠা। এই শ্রোত্র-ব্রহ্ম অনন্ত। তাকে সেভাবেই উপাসনা করতে হয়। জিজ্ঞাসু জনকের জিজ্ঞাসা—অনন্ত কাকে বলে? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—হে রাজন, যে দিকেই কেউ যাক না কেন, তার কোন সীমা পাওয়া যায় না। সুতরাং দিকগুলি অনন্ত। দিক সকলই শোত্র। তাই শ্রোত্রও পরম ব্রহ্ম। যে এই রকম জেনে ব্রহ্মকে উপাসনা করে সে শ্রোত্রেরও করুণা পায়। শ্রবণেন্দ্রিয় তাকে ত্যাগ করে না। যেখানে যে শব্দই উঠুক সবই সে অনুভব করতে পারে। নিখিল বিশ্বের প্রাণী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এভাবে তার মধ্যে জাগে দেবভাব। যার চরম প্রাপ্তি হল দেবত্ব।

শ্রোত্রবিষয়ক জ্ঞানেও পরিতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসু জনক ঋষির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষিণাস্বরূপ আরো এক হাজার হাতির মত বড় বড় বৃষ তাঁকে দান করলে ঋষি সেই একই কথাই বলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনককে আবার জিজ্ঞাসা করেন—আর কোনও আচার্য আপনাকে কোনও উপদেশ দিয়েছেন কি-না? রাজর্ষি বলেন—সত্যকাম-জাবালা আমাকে বলেছেন—"মনই ব্রহ্ম"। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—সত্যকাম ঠিকই বলেছেন। তিনিও আপনাকে মা, বাবা ও শিক্ষাগুরুর মত যথার্থই উপদেশ দিয়েছেন। মনই ব্রহ্ম। কারণ, যার মন নেই, সে কিছুই চিন্তা করতে পারে না। চতুষ্পাদ ব্রহ্মের একপাদ মাত্র হলেন মন-ব্রহ্ম। কিন্তু ঋষি কি আপনাকে সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় সম্বন্ধে কিছু বলেছেন? রাজা বলেন—না। আপনিই আমাকে সে বিষয়ে উপদেশ দিন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন— মনই শরীর, আকাশ হল তার প্রতিষ্ঠা। একে আনন্দ বলেই উপাসনা করা উচিত, তবেই সে বিষয়ে সঠিক ফল পাওয়া যায়। জনক জিজ্ঞাসা করছেন হে যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দ কাকে বলে? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—মনই আনন্দ। মনেরই দ্বারা লোকে স্ত্রী চায়। স্ত্রী থেকে নিজের অনুরূপ পুত্রের জন্ম হয়। সেই পুত্রই আনন্দের কারণ। মনই পরম ব্রহ্ম। মন-ব্রহ্মকে এভাবে জেনে যে তাকে উপাসনা করেন, মন তাকে কোনদিনই ত্যাগ করে না। এমনকি নিখিল বিশ্বের প্রাণীও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে-ও দেবতা হয়ে দেবতাদেরই লাভ করে।

জনক ব্রহ্মর্ষির এই মনোবিষয়ক জ্ঞানেও পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁকে আরও এক হাজার হাতীর মত বড় বড় বৃষ দান করলে, দান বিষয়ে আগের মত একই কথা বলেন যাজ্ঞবল্ক্য।

রাজর্ষি জনকের কাছে ব্রহ্মিষ্ঠতম ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য আরও জানতে চাইলেন—আর কেউ আপনাকে ব্রহ্ম বিষয়ে কোন উপদেশ দিয়েছেন? জনক বলেন—হ্যাঁ দিয়েছেন, আচার্য বিদগ্ধ শাকল্য। তিনি আমাকে

বলেছেন—"হৃদয়ই ব্রহ্ম"। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—হ্যাঁ, মা, বাবা ও শিক্ষাগুরুর মত তিনি আপনাকে সঠিক উপদেশই দিয়েছেন—হৃদয়ই ব্রহ্ম। কিন্তু রাজর্ষি, তিনি আপনাকে এই হৃদয়-ব্রহ্মের আকার বা তার আশ্রয় কোথায় সে বিষয়ে কি কিছু বলেছেন? জনক বলেন—না, তা বলেননি।

এরপর যাজ্ঞবল্ক্য বলতে শুরু করেন—এই ব্রহ্ম এক পাদ মাত্র। হৃদয়ব্রহ্মের হৃদয়ই বাসস্থান। আকাশই তার আশ্রয়। একে স্থিতি অর্থাৎ স্থির এই চিন্তা করে তার উপাসনা করা উচিত। জনক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন—স্থিতিত্ব বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন? ঋষি বলেন—স্থিতি হল স্থির বা নিশ্চিন্ত আশ্রয়। হৃদয়ই সর্বভূতের বাসস্থান বা আশ্রয়। পৃথিবীতে যেখানে যা আছে তাদের সবারই আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা হল হৃদয়। হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। মহারাজ যে লোক এভাবে জেনে ব্রহ্মকে উপাসনা করে হৃদয় তাকে ত্যাগ করে না, নিখিল বিশ্বের প্রাণী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁর হৃদয়ে দেবভাবের প্রকাশ ঘটতে ঘটতে সে নিজেই হয়ে যায় দেবতা।

রাজর্ষি জনক আবার যাজ্ঞবল্ক্যকে এক হাজার বৃষদান করলে ঋষি সেই পূর্বেরই মত উত্তর দেন।

রাজা বুঝলেন—ব্রহ্মিষ্ঠতম যাজ্ঞবল্ক্য একজন অসাধারণ আচার্য। তাঁর অসীম জ্ঞান। তাই তিনি সিংহাসন ছেড়ে ঋষির চরণে শরণ গ্রহণ করলেন। বললেন — যাজ্ঞবল্ক্য, আপনাকে নমস্কার, আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

এবার ঋষি বলেন—আপনি বেদ-উপনিষদ পড়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন। পরন্তু আপনি সম্রাট, জনগণের নিয়ন্তা। দীর্ঘ রাস্তা পার হতে গেলে চাই রথ। আর অন্তহীন সমুদ্র পার হতে হলে চাই উপযুক্ত নৌকা। এসবই আপনার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আপনি কি বলতে পারেন—এই ধূলার ধরণী অর্থাৎ পৃথিবী ছেড়ে, অর্থাৎ এই দেহত্যাগ করে আপনি কোথায় যাবেন? জনক বললেন—ভগবন্ আমি জানি

না। এরপর যাজ্ঞবল্ক্য আত্মবিষয়ক আরও অনেক কথা বলে চললেন। বললেন—যিনি কোনদিন শীর্ণ হন না, যিনি আসক্তিবিহীন, যিনি কোন কিছুতেই জড়িত নন অর্থাৎ নির্লিপ্ত, যাঁকে বধ করা যায় না—অর্থাৎ অবধ্য, যাঁর প্রতি হিংসা করা যায় না, যাঁকে জানলে মানুষ অভয় হয়, আপনি সেই পরম আত্মায় গিয়ে উপস্থিত হবেন। আত্মবিষয়ক গভীর জ্ঞানে মুগ্ধ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রণাম জানিয়ে নিজের সমগ্র বিদেহ রাজ্য, এমনকি নিজেকেও তাঁর কাছে দান করে দিলেন।

এই ভারতবর্ষে অতীতে ব্রহ্মিষ্ঠতম ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের যেমন অভাব ছিল না, তেমনি রাজর্ষি জনকের মতো অনেকেই ছিলেন—যাঁরা ধন-জন-পুত্র-সম্পদ-রাজ্য এমনকি নিজেকে দিয়েও সেই পরম জ্ঞান—যে জ্ঞান পেলে মানুষ অমৃত ও আনন্দস্বরূপ হয়, আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয়—সেই জ্ঞান পেতে ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। অথচ আজকের ভারতবর্ষে কোথায় সেই যাজ্ঞবল্ক্য, আর কোথায়-বা সেই রাজর্ষি জনক! তাই স্বামী প্রণবানন্দজী বলছেন—

"যে ভারতের আদর্শ সন্ন্যাসী ছিলেন—শুক-সমীক-শঙ্করাচার্য ; যে ভারতের সর্বত্যাগী ঋষি ছিলেন—ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাল্মীকি ; যে ভারতের পূতচরিত্র গৃহী ছিলেন—জনক-যুধিষ্ঠির-রামচন্দ্র ; ধ্রুব-প্রহ্লাদ-নচিকেতা ছিলেন যে ভারতের আদর্শ বালক, সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী ছিলেন যে ভারতের আদর্শ সতী-শিরোমণি— সেই ভারতের আজ কী দুর্দিন, দুরবস্থা। ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সেই ভারতের আজ কী দুর্গতি। কী অধোগতি !!

বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে

গ্রন্থে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ শব্দ ও তার অর্থ

অব্যাকৃত = অবিভক্ত, যা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়নি।

অধিদৈব = দেবতা-সম্পর্কিত, যা জ্যোতির্ময়।

অতিবাদী = আত্মা ছাড়া জগতে অন্য বস্তুও আছে বলে যিনি প্রচার করেন। আত্মার অস্তিত্বকে অতিক্রম করে অন্য তত্ত্বের কথা বলেন বলে অতিবাদী।

অশ্বতরী = অশ্ব ও গর্দভের মিলনে উৎপন্ন স্ত্রী পশু।

অধিদৈবত = 'অধিদৈব' দ্রঃ।

অবিদ্যা = অজ্ঞান, মোহ। এই মোহের ও অজ্ঞতার কারণেই আমরা বস্তুর বাইরের রূপটিই দেখি, প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারি না। পরবর্তীকালে এই অবিদ্যার অর্থ দাঁড়ায় 'মায়া', বিশ্বমোহিনী শক্তি।

আত্মরতি = যে অবস্থায় সাধকের কাছে আত্মা ছাড়া অন্য কোন-কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। এই অবস্থায় সাধক আত্মাকেই ভোগ করেন, আত্মাতেই তৃপ্তি লাভ করেন।

আত্মক্রীড় = যে সাধক কেবল আত্মার সঙ্গেই ক্রীড়া করেন, খেলায় অন্য কোন সঙ্গী বা বাইরের উপকরণ থাকে না।

আত্মমিথুন = জীবাত্মা ও পরমাত্মার যুগলবন্দী।

উদ্গাতা = ইনি একজন সামবেদী ঋত্বিক্। সোমযাগে ইনি সামগান করেন।

ঋত্বিক্ = পুরোহিত। গৃহস্থকে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ করান বলে এই নাম।

কৃত = পাশাখেলার একটি 'দান'। পাশার ঘুঁটি চাললে যতগুলি ঘুঁটি মাটিতে পড়ে তা যদি চার দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়, কোন অবশিষ্ট বা ভাগশেষ না থাকে তা হলে সেই দানকে 'কৃত' বলে। এই দান চালতে পারলে জুয়াড়ী জয়ী হয়। অপর তিন প্রকার চালের নাম হচ্ছে, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। পরে এগুলি যুগের নাম হয়ে দাঁড়ায়।

চিত্ত = মন। কখনও কখনও মন ও বুদ্ধির উর্ধ্বে অবস্থিত সূক্ষ্ম বৃত্তিকেও চিত্ত বলা হয়।

চতুষ্কল = চার অংশ। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারদিক অনন্ত ব্রহ্মের চারটি অংশ বা ভগ্নাংশ। এইরূপ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক এবং সমুদ্রও ব্রহ্মের চারটি ভগ্নাংশ।

জাতবেদা = অগ্নি। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে উষ্ণতারূপে এবং জঠরাগ্নি রূপে বর্তমান বলে অগ্নির অপর নাম জাতবেদাঃ।

পাদ = চার ভাগের এক ভাগ। আবার যিনি পরম গন্তব্য, অথবা যার বা যে উপায়ের সাহায্যে সেই পরম গন্তব্যকে লাভ করা যায় তাও পাদ।

প্রস্তোতা = অন্যতম সামবেদী ঋত্বিক্। ইনি সামগানের বিশেষ অংশ গান করেন।

প্রতিহার = অপর এক সামবেদী ঋত্বিক। ইনিও স্তোত্রের বা সামের বিশেষ অংশ গেয়ে থাকেন।

প্রজ্ঞা = অত্যুজ্জ্বল বুদ্ধি বা মনীষা। সুষুপ্তির স্তরে যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ আত্মা বর্তমান তাকে উপলব্ধি করার সাধন এই প্রজ্ঞা।

প্রেয় = জাগতিক সুখ। সাধারণের পক্ষে প্রিয় বলে তা প্রেয়।

প্রকাশবান = যা প্রকাশময়, উজ্জ্বল।

বাক্ = মুখের ভাষা বা শব্দ। এই শব্দের শক্তি যিনি প্রাণীকে দেন তিনি বাগ্‌দেবী।

ব্রহ্মিষ্ঠ = শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মকে যাঁরা জানেন তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ।

বিদ্যা = প্রকৃত জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, সবই যে ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ এই জ্ঞান।

মঘবন = ধনবান ইন্দ্র। এই ধন যেমন পার্থিব সম্পদ তেমন আবার অধিকারীর ভেদে অধ্যাত্মসম্পদ।

মাতরিশ্বা = বায়ু। 'মাতরি' অর্থাৎ অন্তরীক্ষে যিনি দ্রুত ছুটে চলেন বা শ্বাস নেন—এই অর্থে বায়ুকে 'মাতরিশ্বা' বলা হয়।

শ্রেয় = পরম কল্যাণ। সকলের শেষ আশ্রয় বা পরম শ্রীসম্পন্ন বলে শ্রেয়।

যজমান = যে গৃহস্থ যজ্ঞ করছেন। গৃহস্থ আয়োজন করেন, তাঁর হয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন অবশ্য তাঁর ঋত্বিক্ বা পুরোহিতেরা।

হোতা = ইনি ঋগ্বেদী ঋত্বিক্‌দের মধ্যে অন্যতম। যজ্ঞে ইনি দেবতাদের বন্দনা করেন ঋগ্বেদের মন্ত্র আবৃত্তি করে।

সম্বর্গবিদ্যা = সম্বর্গ হচ্ছে গ্রাসকারী, যার মধ্যে কোনকিছু বিলীন হয়। বায়ু ও প্রাণ দেবতাবৃন্দ ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে সম্বর্গ অর্থাৎ গ্রাসকারী। দেবতারা শেষে বায়ুতে এবং ইন্দ্রিয় সমূহ প্রাণে বিলীন হয়। সম্বর্গ সম্পর্কিত বিদ্যা সম্বর্গবিদ্যা।

সর্বগত = যিনি বিশ্বের সর্বত্র গিয়েছেন অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন সেই ব্রহ্ম।

অবসর = ফাঁক।

অগ্নিচয়ন = মাটির উপর থাকে থাকে ইট সাজিয়ে সেই সাজানো ইটগুলির উপর মাটি লেপে দেওয়া হয়। শেষ থাকের উপরে রাখা হয় যজ্ঞের অগ্নি। ইট-সাজানো এবং আগুন রাখার পদ্ধতিকে বলে অগ্নিচয়ন।

পুণ্ডরীকাক্ষ = পুণ্ডরীক মানে পদ্ম। অক্ষি বা অক্ষ মানে চোখ। যাঁর চোখ পদ্মের মতো সুন্দব তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ। অনেক সময়ে হৃৎপিণ্ডকে উপনিষদে পুণ্ডরীকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

অঙ্গিরস্ = প্রাচীন ঋষিদের অন্যতম। ইনি অথর্ববেদের বিশেষ মন্ত্রসমূহ আবিষ্কার করেন।

একর্ষি = একমাত্র ঋষি, একাকী গমনরত। সাধারণত সূর্য ও প্রাণকে একর্ষি বলা হয়, কারণ তারা একমাত্র অধিপতিরূপে আকাশে এগিয়ে চলেছে।

অনুগ্রাহক = অনুগ্রহকারী, উপকারকারী।

সুষুপ্তি = গাঢ় নিদ্রা, যে নিদ্রায় মানুষ কোন স্বপ্নও দেখে না।

সমিৎ (ধ) = যজ্ঞের কাঠ। দৈর্ঘ্যে এক বিঘত (১২ আঙুল) পরিমাণ। সাধারণতঃ পলাশ কাঠ কেটে তৈরী করা হয়।

ব্রহ্মচর্য = ব্রহ্ম মানে বেদ। গুরুগৃহে গিয়ে বালককে যে-সব নিয়ম পালন করতে হয় তা ব্রহ্মচর্য। ইন্দ্রিয়-সংযম ব্রহ্মচর্যের অন্যতম ব্রত বা অঙ্গ।

সংস্কার = উৎকর্ষ সাধন। উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সব-কিছুরই উদ্দেশ্য মানুষকে জীবত্ব থেকে শিবত্বকে উন্নীত করা। তাই এগুলিকে সংস্কার বলে। সংস্কার সাধন করে বলে সংস্কার।

ইন্দ্রিয় = চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। এগুলি দিয়ে আমরা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ অনুভব করি; এগুলির দ্বারা জ্ঞান অর্জন হয় বলে, এগুলি 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' এছাড়া মুখ, হাত, পা, গুহ্যদ্বার ও মূত্রদ্বার এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। এগুলির দ্বারা প্রাত্যহিক কাজ আমরা করে থাকি বলে এগুলিকে বলে 'কর্মেন্দ্রিয়'। মন হচ্ছে এর অতিরিক্ত দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন অপর এক ইন্দ্রিয়। মোট তাই একাদশ ইন্দ্রিয়।

জীবাত্মা = যে মহান আত্মা ক্ষুদ্র জীবরূপে আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থান করছেন।

পিপ্পলাদ = অথর্ববেদের প্রচারকারী বিশেষ ঋষি। পিপ্পল ফল ভক্ষণ করতেন বলে হয় তো তাঁর এই বিশেষ নাম। সে ক্ষেত্রে এটি ঋষির ছদ্মনামই।

ব্রহ্মাণ্ড = বিশ্ব। ব্রহ্মেরই যেন অণ্ড তাই এই বিশ্ব হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড।

আত্মতত্ত্ব = আত্মার স্বরূপ। আত্মা মানে আপন, প্রকৃত আমি।

অধ্যাত্মযোগ = আত্মার সঙ্গে নিত্য যোগ স্থাপন বা যোগস্থাপনের উপায়।

বৈশ্বানর = জাগ্রৎ অবস্থার আত্মা হচ্ছে 'বৈশ্বানর' বা 'বিরাট'। মানুষ যেমন তার স্থূল আত্মা নিয়ে জগৎকে দেখে ও ভোগ করে তেমন এই বিশ্বও যেন তার স্থূল আত্মা বা অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের দেখছে। এই স্থূল বিশ্বাত্মাই বৈশ্বানর। স্বপ্নে যেমন মানুষ সূক্ষ্ম আত্মা বা অস্তিত্ব দিয়ে ভোগ করে

তেমন বিশ্বের যে সূক্ষ্ম আত্মা তা হল 'হিরণ্যগর্ভ', সূত্রাত্মা বা মহাপ্রাণ।

শব্দব্রহ্ম = যে ব্রহ্ম শব্দময়ী মূর্তি নিয়ে বর্তমান। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, শব্দও চৈতন্যস্বরূপ। কারণ শব্দের সাহায্যেই আমরা জ্ঞান অর্জন করি, নিজেদের চেতনা অপরের কাছে প্রকাশ করি। শব্দচৈতন্য তাই ব্রহ্মই। শব্দের মোড়কে ঘেরা ব্রহ্ম (= চৈতন্য) বলে শব্দব্রহ্ম।

অতিপ্রশ্ন = অতিরিক্ত প্রশ্ন, সীমা অতিক্রম করে যে প্রশ্ন। কূট বুদ্ধিতে যে প্রশ্ন করা হয় তা।

পঞ্চ প্রাণ = প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটি দেহস্থ বায়ু। হৃদয়ে স্থিত বায়ু হচ্ছে প্রাণ, মলদ্বারে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সর্বশরীরব্যাপী যে বায়ু তা ব্যান।

গ্রন্থ সম্বন্ধে বিদগ্ধজনের অভিমত

স্বামী যুক্তানন্দ প্রণীত 'উপনিষদের গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থটি পড়ে আমার কাছে উপনিষদ্ নামক চিরন্তন সাহিত্যের বিশাল গুরুত্বের ছবি নতুন ক'রে প্রতিভাত হ'ল। বৈদিক সাহিত্যের শেষ ভাগটিকে আমরা উপনিষদ্ (বা বেদান্ত) বলি। দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে উপনিষদ্গুলি আমাদের জীবনের চরম প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। সেগুলির মধ্যে শঙ্করাচার্য যে বারোখানি উপনিষদের (ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকি) প্রচার সব থেকে বেশী। উপনিষদের প্রকাশ গদ্য ও পদ্য উভয় মাধ্যমেই। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক বেদের দুটি প্রধান ভাগ, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ অংশের পরিশিষ্ট হ'ল উপনিষদ্। তাই উপনিষদের গদ্যাংশের ভাষা ব্রাহ্মণ ভাগের সমগোত্রীয়। পদ্যাংশে মূল সংহিতা থেকে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। উপনিষদ্কে বলা হয় বেদজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবৈশ্বর্যময় আধার। অনেক সময়ই চিত্তরঞ্জক গল্পের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনছলে বা অন্যভাবে এই জ্ঞান পরিবেশন করা হয়েছে। স্বামী যুক্তানন্দ সহজ সুন্দর ভাবে গল্পগুলি আমাদের শুনিয়েছেন এবং প্রয়োজন মতো এই গল্পগুলির অন্তর্নিহিত বাণীর প্রতিধ্বনি শুনিয়েছেন স্বামী প্রণবানন্দের মুখে। এইসব কাহিনীতে যে তেজ-বীর্যের কথা, দুর্বলতা-পরিহারের কথা, অভীঃ বা ভয়শূন্য হওয়ার আহ্বান, দৈহিক-

মানসিক-আধ্যাত্মিক-মুক্তির নির্দেশ, সত্যকে আশ্রয় করার কথা, সৃষ্টি রহস্যের কথা, আত্মাকে জানার উপায় প্রভৃতি বিষয়ের দার্শনিক ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে তা প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করায় এবং কাহিনীগুলি সম্পূর্ণভাবেই অসাম্প্রদায়িক হওয়ায়, সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে স্বামী মুক্তানন্দ প্রশংসার্হ হবেন।

ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়;
সহ-সভাপতি, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা;
সম্পাদক, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা